POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

আল্লাহ্‌র বাণী

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِي السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ
وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ
النَّاسِ ؕ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ○

যাহারা খরচ করে সচ্ছলতায় এবং অসচ্ছলতায়ও এবং যাহারা ক্রোধ সংবরণকারী ও মানুষের প্রতি মার্জনাশীল,বস্তুত আল্লাহ্ ভালবাসেন সৎকর্মশীলগণকে।

(আলে ইমরান:১৩৫)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 4

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 39

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 26 সেপ্টেম্বর, 2019 26 মহররম 1441 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

আমি তোমাদের জানাচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লার শক্তি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউই সম্যক অবগত হতে পারে না। যে ব্যক্তি এমন দাবি করে সে খোদাকে অস্বীকারকারী।
ইমাম ফখরুদ্দীন রাজির এই উক্তি এক্ষেত্রে যথাযথ হবে। 'যে ব্যক্তি খোদা তা'লাকে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ধারণ করতে চায় সে বড়ই নির্বোধ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

কুরআন শরীফ এবং তওরাতের শিক্ষার মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য

দ্বিতীয় পার্থক্য হল তওরাত কেবল বনী ইসরাঈল জাতিকে সম্বোধন করেছে, অন্যান্য জাতির সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এই কারণেই যুক্তি-প্রমাণের উপর এতে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় নি। কেননা তওরাতের দৃষ্টিতে নাস্তিক, দার্শনিক ও ব্রহ্ম সম্প্রদায় ছিল না। যেহেতু কুরআন সমস্ত জাতি ও সম্প্রদায়কে দৃষ্টিতে রেখেছে এবং তাদের সকল চাহিদা এই পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল, সেই কারণে কুরআন করীম ধর্ম-বিশ্বাস এবং প্রয়োগিক আদেশাবলী, উভয়ের ক্ষেত্রেই নিঁখুত যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করেছে।

কুরআন করীম ঘোষণা করে, قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَ يَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ তুমি মোমেনদেরকে বলে দাও, তারা যেন কারো গোপন স্থানের দিকে কামলোলুপ দৃষ্টি না দেয় এবং অন্যান সকল 'ফুরুজ' (গোপন অঙ্গের) সুরক্ষা করে। (সূরা নূর, আয়াত:৩১) পুরুষদের জন্য তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখা আবশ্যক, যাতে 'গায়ের মহররম' (পরনারী) নারীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তারা পরীক্ষায় নিপতিত না হয়। কানও 'ফুরুজ'-এর অন্তর্ভুক্ত। (মন্দ) কাহিনী শুনে মানুষ কামলালসায় গ্রস্ত হতে পারে। এই কারণেই সর্বজনীনভাবে মানুষকে দেহের সকল উন্মুক্ত স্থানকে সুরক্ষিত রাখার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং বলা হয়েছে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ রাখ। 'যালিকা আযকা লাহুম' (নূর, আয়াত: ৩১) এটি তোমাদের জন্য উত্তম, এই পন্থা উৎকৃষ্টমানের পবিত্রতার ধারক যা তোমাদেরকে মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখবে।

কুরআন শরীফ যুক্তি-প্রমাণ নিজেই বর্ণনা করে

দেখ! এই একটি বিষয়ের দিকেই লক্ষ্য কর যা তওরাতেও নিজস্ব ভাষা ও ভঙ্গিতে বর্ণিত হয়েছে, সেটি কুরআন শরীফ কিরূপ সুস্পষ্টভাবে ও বিশদরূপে যুক্তি-প্রমাণ দিয়ে বর্ণনা করেছে। এটি একমাত্র কুরআন করীম-এর নিদর্শন, যা তার মান্যকারীদেরকে অন্য কোনও কিছুর মুখাপেক্ষী হতে দেয় না। নিজের পক্ষ থেকেই যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে তাকে অনন্যসাপেক্ষ করে তোলে। কুরআন করীম দলিলসহকারে বিধান প্রকাশ করেছে, প্রত্যেক বিধিনিষেধের জন্য পৃথক পৃথক যুক্তি উপস্থাপন করেছে। মোটকথা তওরাত এবং কুরআন -এর এই দুটিই প্রধান পার্থক্য। পূর্বোক্ত গ্রন্থটি যুক্তি-প্রমাণের পথ গ্রহণ করে নি, এর দাবির যুক্তি নিজেকেই সন্ধান করতে হয়। শেষোক্ত গ্রন্থটি নিজের দাবির সপক্ষে নিজেই সমস্ত যুক্তি উপস্থাপন করার পর দাবি করে, খোদার বিধানকে জোরপূর্বক মানতে বাধ্য করে না, বরং মানুষের মুখ থেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীকারুক্তি আদায় করে নেয়। জোরপূর্বক বা বাধ্য করে নয়, বরং সূক্ষ্ম দলিলের মাধ্যমে তাদের অনুরক্ত করে, এর নির্দেশাবলী সহজাতভাবেই গ্রহণযোগ্য। তওরাত কেবল একটি বিশেষ জাতিকে সম্বোধন করে, অপরদিকে কুরআন সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করে যারা কিয়ামত দিবস পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করতে থাকবে। এখন বল তওরাত এবং কুরআন কিভাবে সমান হতে পারে আর তওরাতের পর কেনই-বা কুরআনের প্রয়োজনীয়তা থাকবে না? কুরআন যখন আদেশ দেয়, 'তুমি ব্যাভিচার করো না', তখন এর দ্বারা সমগ্র মানবজাতিকে সম্বোধন করা হয়। কিন্তু এই একই কথা যখন তওরাতে বর্ণিত হয়, তখন কেবল সেই বনী ইসরাঈল জাতিকেই সম্বোধন করা হয়। এটিও তওরাতের সীমিত পরিসর এবং অস্পষ্ট প্রকৃতিকেই প্রকাশ করে, কিন্তু সেই ব্যক্তির জন্যই যার অন্তর্দৃষ্টি এবং খোদাভীতিপূর্ণ হৃদয় আছে।

ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক নিদর্শন

তওরাত এবং কুরআন করীমের মধ্যে একটি বিরাট পার্থক্য হল কুরআনের মধ্যে ভৌতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় প্রকারের নিদর্শন বিদ্যমান। যেমন-'শাক্কুল কামার'-এর নিদর্শন ভৌতিক নিদর্শনগুলির মধ্যে অন্যতম।

প্রকৃতির নিয়মের কোন সীমাবদ্ধতা নেই

কিছু নির্বোধ মানুষ প্রকৃতির নিয়মের ছুতোয় 'শাক্কুল কামার'-এর নিদর্শনের উপর আপত্তি উত্থাপন করে। কিন্তু তারা এতটুকুও জানে না যে খোদার শক্তিমত্তা এবং নিয়মাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানলাভ করা বা ধারণা করা সম্ভব নয়। হায়! একদিকে তো সে খোদা তা'লার উপর ঈমান আনে, কিন্তু অপরদিকে তার হৃদয় ও আত্মা খোদা তা'লার সুবিশাল ও নিগূঢ় শক্তি উপলব্ধি করে যখন সিজদায় লুটিয়ে পড়তে চায়, ঠিক সেই সময় সে খোদা তা'লাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায়। যদি খোদা তা'লার সত্তা এবং শক্তিসমূহ আমাদেরই চিন্তাধারা এবং কল্পনার ন্যায় সীমাবদ্ধ হত, তবে আর দোয়ার প্রয়োজন কিসের? কিন্তু এমনটি মোটেই না। আমি তোমাদের জানাচ্ছি, আল্লাহ্ তা'লার শক্তি এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে কেউই সম্যক অবগত হতে পারে না। যে ব্যক্তি এমন দাবি করে সে খোদাকে অস্বীকারকারী। কিন্তু কতই না দুর্ভাগা সেই নির্বোধ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ তা'লাকে অসীম শক্তির অধিপতি জানা সত্ত্বেও একথা বলে যে 'শাক্কুল কামর' এর নিদর্শন প্রকৃতির নিয়মের পরিপন্থী। নিশ্চিত জেনে রাখ! এমন ব্যক্তি সুস্থ বুদ্ধি এবং অন্তরের দূরদর্শীতা থেকে বঞ্চিত। ভালভাবে স্মরণ রেখো! প্রকৃতির নিয়মের উপর কখনও নির্ভর করো না, অর্থাৎ প্রকৃতির নিয়মের জন্য এমন কোনও সীমা নির্ধারণ করে এই ধারণা করে বসো না যে খোদার ঈশ্বরত্বের সকল রহস্য এরই মধ্যেই নিহিত। এমনটি হলে খোদার সমগ্র সত্তার ঈশ্বরীয় তত্ত্ব তোমাদের হাতের মুঠোয় হত। না, মানুষের এমন দুঃসাহস ও স্পর্ধা প্রদর্শন করা মোটেই উচিত নয় যা তাকে 'উবুদিয়াত' বা খোদার দাসত্বের মর্যাদা থেকে বিচ্যুত করে। ধ্বংসই এর চূড়ান্ত পরিণতি। খোদার শক্তিমত্তাকে কোন সীমার মধ্যে বেঁধে রাখার মত নির্বুদ্ধিতা দেখানো মোমেনের দ্বারা সম্ভব নয়। ইমাম ফখরুদ্দীন রাজির এই উক্তি এক্ষেত্রে যথাযথ হবে। 'যে ব্যক্তি খোদা তা'লাকে যুক্তিতর্কের মাধ্যমে ধারণ করতে চায় সে বড়ই নির্বোধ। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৭২-৭৪)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৮ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর যুক্তরাষ্ট্র সফর

(অবশিষ্ট রিপোর্ট)

(হুযুর আনোয়ারের ভাষণের শেষাংশ)

একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, খোদা তা'লার সৃষ্টির প্রতি এমন আচরণ করুন যেভাবে আপনারা নিজেদের নিকটাত্মীয়দের সঙ্গে করে থাকেন। মানুষের সঙ্গে সেই আচরণই করুন যেভাবে মা তা শিশুর সঙ্গে করে থাকে। এটিই আপনাদের পন্থা হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনি কাউকে সাহায্য করছেন এই আশায় যে পরে কোনও উপকার পাবেন- এমন নীতি মোটেই কাম্য নয়।

অনুরূপভাবে তিনি বলেন: কুরআন করীমে সূরা নহলের ৯১ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা মুসলমানদের আদেশ দিয়েছেন ন্যায়পরায়ণতার এবং অপরের কল্যাণ সাধন করার। এমনকি তাদের সঙ্গেও ভাল আচরণ করুন যারা তোমাদের কোনও উপকার করে নি। বরং এর থেকে উন্নত নৈতিকতা প্রদর্শন করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করা উচিত এবং সেভাবে তাদের প্রতি যত্নবান হওয়া উচিত যেভাবে মায়েরা শিশুর যত্ন নেয়। কি উৎকৃষ্ট মানের শিক্ষা! মায়েরা কিভাবে সন্তানদেরকে ভালবাসে, সেই অভিজ্ঞতা আমাদের সকলেরই আছে। মায়েরা সেই ভালবাসার কোন প্রতিদান চায় না, এর জন্য প্রশংসা করা হোক তাও তারা চায় না। মায়েরা নিজেদের থেকে সন্তানদের বেশি ভালবাসেন। সন্তানকে রক্ষা করা কিংবা যত্ন নেওয়ার সংকল্প থেকে কখনই তারা বিচ্যুত হয় না। অতএব, আমাদের কাছে ইসলামের দাবি হল আমরা যেন সন্তানের প্রতি মায়েদের নিঃস্বার্থ ভালবাসার অনুরূপ ভালবাসা কেবল সন্তানদের প্রতিই সীমাবদ্ধ না রাখি, সমগ্র মানব জাতিই যেন এর থেকে অংশ পায়।

হুযুর আনোয়ার বলেন, বাহ্যিকভাবেও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অপরের সেবা করার কোনও সুযোগ হাতছাড়া করেন নি। যেমন, উনবিংশ শতকে তিনি ভারতের এমন একটি ছোট্ট গ্রামে বসবাস করতেন যেখানে যথারীতি চিকিৎসা সেবা উপলব্ধ ছিল। কিন্তু মানবতার সেবার চেতনায় জাগরিত হয়ে তিনি প্রথাগত চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যায়ন করেছিলেন, আর তাঁর ঘরে বিভিন্ন প্রকারের ঔষধিও রাখা থাকত। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে স্থানীয় মানুষেরা তাঁর কাছে আসত, আর তিনি তাদের প্রয়োজন অনুসারে ওষুধ দিতেন।

দুঃস্থ ও অসহায় অনেক মানুষ এই সেবা থেকে উপকৃত হয়েছে। এর পিছনে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ছিল মানবতার সেবা করা। এই অমূল্য ভাণ্ডার ও মহান উত্তরাধিকারই তিনি জামাতের জন্য রেখে গেছেন। কাজেই সমগ্র বিশ্বে জামাত আহমদীয়ার মানবতার সেবার জন্য প্রচেষ্টাসমূহের পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য হল সমগ্র মানবজাতির দুঃখ কষ্ট দূর করা। এই কারণেই হিউম্যানিটি ফার্স্ট এই এলাকায় নিজেদের প্রথম হাসপাতাল স্থাপন করল।

আমি মনপ্রাণে দোয়া করি, এই হাসপাতাল যেন নিজের উদ্দেশ্য পূর্ণ করে, জাতি ধর্ম ও ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলের দুঃখ কষ্ট দূর করার এক উৎকৃষ্ট মাধ্যম হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। যেরূপ আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, আমরা পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা কোন প্রতিদান বা প্রশংসা পেতে আগ্রহী নই। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও প্রীতি অর্জন করা। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই বাণী আমাদের পথের দিশারী যেখানে তিনি বলেছেন, 'মানবতার সেবা হল আমাদের জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করার এবং তাঁর পুরস্কার ও কল্যাণরাজি লাভের মাধ্যম।

আমার বিশ্বাস, এখন আপনাদের কাছে স্পষ্ট যে আমরা কোনও আর্থিক লাভ বা খ্যাতি অর্জনের উদ্দেশ্যে হাসপাতাল নির্মাণ করি নি, দেশের মানুষকে উচ্চমানের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে মানবতার সেবা করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আপনারা আস্থা রাখুন, এই হাসপাতালের মাধ্যমে যেটুকু অর্থ একত্রিত হবে, তা গোয়েতেমালার মানুষের আরও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহৃত হবে, এর থেকে একটি কড়িও গোয়েতেমালার বাইরে পাঠানো হবে না। রোগীদের চিকিৎসা খরচ বাবৎ যেটুকু উপার্জন হবে, গোয়েতেমালার মানুষের জন্যই তা পুনরায় খরচ করা হবে, যাতে সুনিশ্চিত করা যায় যে যারা চিকিৎসা করাতে পারে না, তাদেরকে কম খরচে বা সম্ভব হলে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা সম্ভব হয়। এছাড়া যে টুকু উপার্জন হবে তা হাসপাতালের পরিষেবার মানকে বজায় রাখতে বা আরও উন্নত করতে অর্থাৎ মানুষকে আরও উন্নত পরিষেবা দানের জন্য ব্যবহৃত হবে। আমাদের বিগত জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি আমার এই কথার সত্যতার প্রমাণ। আমরা যেখানেই হাসপাতাল নির্মাণ করেছি, সেখানে অর্জিত অর্থকে আমরা দেশের বাইরে পাঠাই নি, বরং তা সব সময় সেই দেশের মানুষের মাঝে এমনভাবে ফিরিয়ে দিয়েছি যাতে তারা উপকৃত হয়। এখানে গোয়েতেমালার ক্ষেত্রেও ঠিক তেমনটিই হবে। জাতির সেবার উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ চূড়ান্ত বিন্দু নয়, এর সূচনা হল মাত্র। আমার দোয়া এবং আশা, এই হাসপাতাল জনকল্যাণমূলক আরও অন্যান্য প্রকল্পের মধ্যে অন্যতম বিন্দু হিসেবে স্থান পাবে যার সূচনা আমরা এখানে করব।

আমি দোয়া করব, মানবতার সেবার কর্তব্য ও দায়িত্বাবলী পালনের জন্য নিজেদের প্রচেষ্টাকে যেন উন্নত থেকে উন্নতর মাত্রায় নিয়ে যেতে পারি। আমি এও দোয়া করি, আল্লাহ্ তা'লা এই হাসপাতালকে সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাফল্যমণ্ডিত করুন এবং একের পর এক উন্নতির সোপান অতিক্রম করার তৌফিক দান করুন। এই হাসপাতাল যেন মানবতার সেবার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে ওঠে। এটি যেন রুগীদেরকে যথাসম্ভব চিকিৎসা দিতে পারে এবং এখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং কর্মীরা বিশেষত অভাবী এবং বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষদের স্বাচ্ছন্দ এনে দিতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে। আল্লাহ্ তা'লা চিকিৎসক এবং কর্মীদের প্রচেষ্টায় আশিস দান করুন এবং নিজ কৃপাগুণে তাদের হাতে আরোগ্য দানের গুণ দান করুন। হাসপাতালের প্রবন্ধকরা যেন এটিকে এমনভাবে পরিচালনা করে যাতে দরিদ্র ও অসহায় ব্যক্তিরা যারা চিকিৎসা করানোর সামর্থ রাখে না, তাদেরকে সুলভে বা যতদূর সম্ভব বিনামূল্যে চিকিৎসা করানো যায়। হাসাপাতালের নাম রাখা হয়েছে 'নাসের হাসপাতাল'। 'নাসের' বলা হয় অসহায় ব্যক্তির সহায় বা অবলম্বন দানকারীকে। অতএব, আমি দোয়া করি, এই হাসপাতাল যেন সব সময় সমস্ত দিক থেকে নিজের নামের প্রতি সুবিচার করতে পারে। আমি দোয়া করি এটি এমন এক অনন্য প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠুক যা নিজের উৎকৃষ্ট মানের জন্য খ্যাতি লাভ করে, আর এই হাসপাতাল যে সমাজের অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্যের জন্য বদ্ধপরিকর, এটিই যেন এর সব থেকে বড় পরিচয় হয়ে ওঠে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: সবশেষে দোয়া করি, সমস্ত মানুষ যেন জাতি বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে মানবতার সেবার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয় এবং সমাজের সুখ-সমৃদ্ধির জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সম্প্রীতির স্পৃহা নিয়ে কাজ করে। বর্তমান যুগে যেভাবে জাতিসমূহ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রয়েছে এবং যোগাযোগের মাধ্যমগুলি হাতের নাগালে এসেছে, তাতে পৃথিবী এক 'গ্লোবাল ভিলেজ' বা বিশ্বপল্লীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। কাজেই, সমস্ত জাতি এবং ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও ভালবাসাকে বিস্তৃতি দেওয়ার কাজকে পূর্বের থেকে বেশি তৎপরতার সঙ্গে পালন করা মানবজাতির কর্তব্য। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তিক্ত বাস্তব হল আমাদের পারস্পরিক সম্প্রীতির মান উন্নত না হয়ে বরং অধঃপতিত হচ্ছে। আত্মকেন্দ্রিকতা, লালসা এবং আত্মাহংকারের পরিবেশ গোটা সমাজকে গ্রাস করছে। অতএব আমার আন্তরিক প্রার্থনা, মানুষ যেন স্বার্থপরতা ত্যাগ করে মানবতাকে রক্ষা করা এবং আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির প্রতি ভালবাসা ও সহানুভুতি পোষণ করার গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। আমি দোয়া করি, মানবতার সেবার স্পৃহা চিরকালের জন্য সমাজে বদ্ধমূল হোক যাতে আমরা নিজেদের ভবিষ্যতকে সুরক্ষিত রাখতে পারি এবং আগামী প্রজন্মের জন্য এক উন্নত জগত রেখে যাতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে নিজেদের দায়িত্বাবলী পালন করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

প্রেস কনফারেন্স

সাংবাদিক সম্মেলনের জন্য নিম্নোক্ত সংবাদ পত্র এবং টেলিভিশন চ্যানেলের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

চ্যানেল-৭-এর তিনজন সাংবাদিক ও প্রতিনিধি, প্রেস্সা লিব্রে পত্রিকার দুইজন সাংবাদিক, নিউস্ট্রো ডাইয়ারিয়োর পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধ এবং রেভিস্টা সুমার পক্ষ থেকে একজন প্রতনিধি উপস্থিত ছিলেন।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, হাসপাতালের মত প্রকল্প অন্যান্য অঞ্চলেও গ্রহণ করবেন? হুযর আনোয়ার (আই.) বলেন, আপনারা নিশ্চয় আমার বক্তব্য শুনেছেন। সবে তো সূচনা হল, এটিই চূড়ান্ত বিন্দু

এর পর ১১ পাতায়

জুমআর খুতবা

‘সেটিই প্রকৃত মসজিদ যার ভিত্তি তাকওয়ার উপর প্রতিষ্ঠিত।’

আমাদের মসজিদগুলি যেন তাকওয়ার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় এই প্রচেষ্টা করা উচিত।

নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার মূর্তপ্রতীক বদরী সাহাবাগণ

হযরত আসিম বিন আদি, হযরত আমর বিন অউফ এবং হযরত মাআন বিন আদি রাযিআল্লাহু আনহুম-এর পবিত্র জীবনালেখ্য

নবী করীম (সা.)-এর পক্ষ থেকে মসজিদ যিরার ভেঙ্গে ফেলার নির্দেশ এবং এর পটভূমি।

নবী করীম (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আবু বকর (রা.)-এর খিলাফত পদে অধিষ্ঠিত হওয়ার ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ

আল্লাহ্ তা’লা প্রত্যেক আহমদীকেও নবুয়তের মর্যাদা অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন এবং খিলাফতের সঙ্গে নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততার সম্পর্ক তৈরী করার তৌফিক দান করুন।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো’মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বায়তুল ফুতুহ, মডার্ন থেকে প্রদত্ত ২৩ আগস্ট , ২০১৯, এর জুমুআর খুতবা (২৩ যহুর, ১৩৯৮ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:বদরী সাহাবীদের স্মৃতিচারণে আজ আমি যেসব সাহাবীর কথা বলব, তাদের মাঝে একজনের নাম হলো হযরত আসেম বিন আদী (রা.)। হযরত আসেম (রা.)-র পিতার নাম ছিল আদী। তার সম্পর্ক ছিল বনু আজলান বিন হারেসা গোত্রের সাথে যারা ছিল বনু যায়েদ বিন মালেক গোত্রের মিত্র। হযরত আসেম ছিলেন বনু আজলান গোত্রের নেতা এবং হযরত মাআন বিন আদী-র ভাই।

বলা হয় যে, হযরত আসেম এর উপনাম ছিল আবু বকর। কিন্তু কারো কারো মতে তার ডাকনাম আবু আব্দুল্লাহ্, আবু উমর এবং আবু আমর বলেও বর্ণিত হয়েছে। হযরত আসেম মাঝারি উচ্চতার মানুষ ছিলেন এবং চুলে মেহেদী লাগাতেন। হযরত আসেম এর পুত্রের নাম ছিল আবুল বাদ্দাহ।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩৫৪-৩৫৫) (উসদুল গাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১১১, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০৩)

এবং কন্যার নাম ছিল সেহলা, যার বিয়ে হয়েছিল হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ এর সাথে,আর এই বিয়ের মাধ্যমে তাদের ছিল চার সন্তান, তিন পুত্র ও এক কন্যা, যাদের নাম ছিল মাআন, উমর ও যায়েদ এবং আমাতুর রহমান সুগরা। (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৯৪)

বদর অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে মহানবী (সা.) হযরত আসেম বিন আদী-কে কুবা এবং মদিনার উঁচু অংশ অর্থাৎ ‘আলিয়া’-র আমীর নিযুক্ত করেন। এক রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, রওহা নামক স্থান থেকে মহানবী(সা.) হযরত আসেমকে মদিনার উঁচু অংশ অর্থাৎ‘আলিয়া’-র আমীর নিযুক্ত করে পাঠালেও তাকে বদরের সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং তার জন্য মালে গনিমতে (যুদ্ধলব্ধ সম্পদে) অংশও নির্ধারণ করেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩৫৫) (আল আসাব ফি তামিযি সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া বেরুত)

হযরত মির্যা বশির আহমদ সাহেব কর্তৃক লিখিত ‘সীরাতে খাতামান্নাবিঈন’ পুস্তকে এই ঘটনার বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে:- মদিনা থেকে যাত্রার সময় তিনি (সা.) তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুমকে মদিনার আমীরের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। কিন্তু মদিনা থেকে ৩৬ মাইল দূরত্বে অবস্থিত রওহা নামক স্থানের কাছাকাছি পৌঁছে সম্ভবত এই ধারণায় যে, আব্দুল্লাহ্ একজন অন্ধ ব্যক্তি আর কুরাইশ বাহিনীর আগমনের সংবাদের দাবি হলো তাঁর (সা.) অনুপস্থিতিতে মদিনার প্রশাসন সুদৃঢ় থাকা উচিত, তিনি (সা.) আবু লুবাবা বিন মুনযেরকে মদিনার আমীর নিযুক্ত করে ফেরত পাঠান এবং আব্দুল্লাহ্ বিন উম্মে মাকতুম সম্পর্কে নির্দেশ দেন যে, তিনি শুধু নামাযের ইমাম হবেন কিন্তু প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করবেন আবু লুবাবা। মদিনার উঁচু অংশের জনবসতি অর্থাৎ কুবার জন্য তিনি (সা.) আসেম বিন আদীকে পৃথক এক আমীর নিযুক্ত করেন। (সীরাত খাতামাননাবীঈন, পৃ: ৩৫৪)

হযরত আসেম উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। হযরত মুআবিয়ার শাসনামলে হযরত আসেম ৪৫ হিজরী সনে মদিনায় মৃত্যু বরণ করেন আর তখন তার বয়স ছিল ১১৫ বছর। কারো কারো মতে তিনি ১২০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। হযরত আসেমের মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসে, তখন তার পরিবারের সদস্যরা বিলাপ আরম্ভ করলে তিনি বলেন, আমার জন্য কেঁদো না কেননা আমি আমার জীবন পার করে এসেছি এবং অনেক দীর্ঘ এক জীবন কাটিয়েছি।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩৫৪-৩৫৫) (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৪৬৪, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া)

মহানবী (সা.) যখন সাহাবীদেরকে তবুকের যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার আদেশ দেন তখন তিনি (সা.) ধনীদেরকে খোদার পথে ধনসম্পদ এবং বাহন সরবরাহ করার আহ্বানও জানান। এতে বিভিন্ন মানুষ নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী কুরবানী করে। এ সময়েই হযরত আবু বকর নিজ ঘরের সমস্ত ধনসম্পদ নিয়ে আসেন যা প্রায় চার হাজার দিরহাম ছিল। মহানবী (সা.) হযরত আবু বকরকে জিজ্ঞেস করেন, নিজ পরিবারের জন্য কিছু রেখে এসেছ কি-না? তিনি উত্তরে বলেন, পরিবারের জন্য আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলকে রেখে এসেছি। হযরত উমর (রা.) নিজ ঘরের অর্ধেক সম্পদ নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) হযরত উমরকে জিজ্ঞেস করেন, নিজ পরিবারের জন্য কিছু রেখে এসেছ কি? তিনি উত্তরে বলেন, অর্ধেক সম্পদ রেখে এসেছি। তখন হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ একশত উকিয়া প্রদান করেন (এক উকিয়া চল্লিশ দিরহামের সমান হয়ে থাকে)। তিনি (সা.) বলেন, উসমান বিন আফফান এবং আব্দুর রহমান বিন অউফ হচ্ছেন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র ধনভাণ্ডারের মালিক যারা আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য ব্যয় করে। এ উপলক্ষ্যে মহিলারাও নিজেদের অলঙ্কারাদি দান করে। এই পলক্ষ্যেই হযরত আসেম বিন আদী, যার স্মৃতিচারণ করা হচ্ছে, তিনি ৭০ ওয়াসাক খেজুর দান করেন। এক ওয়াসাক-এ ষাট সা’ হয়ে থাকে আর এক সা’ হচ্ছে প্রায় আড়াই সের বা কিলো। এদিক থেকে খেজুরের মোট ওজন হয় ২৬২ মণ।

(আসসীরাতুল হুলবিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৮৩-১৮৪) (লুগাতুল হাদীস, ১ম খণ্ড, পৃ: ৮২, নাশির নুমানি কুতুব খানা লাহোর, ২০০৫)

পাকিস্তানে এক মণ-এ চল্লিশ সের হয় অথবা উনচল্লিশ বা আটত্রিশ কিলো হয়ে থাকে। যাহোক হযরত আসেমও এই উপলক্ষ্যে তার কাছে যে খেজুর ছিল তা দান করেন এবং বহুল পরিমাণে দান করেন। হযরত আসেম বিন আদী সেসব সাহাবীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন যাদেরকে মহানবী (সা.) মসজিদে

যিরার ভাঙার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই ঘটনার বিবরণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, বনু আমর বিন অউফ মসজিদে কুবা নির্মাণ করে এবং মহানবী (সা.)-এর কাছে, এসে এতে নামায পড়ার বার্তা প্রেরণ করেন। বনু গানাম বিন আওফ গোত্রের কিছু মানুষও এই মসজিদটিকে দেখে বলে, চল আমরাও একটি মসজিদ নির্মাণ করি যেভাবে বনু আমর নির্মাণ করেছে। তখন তাদেরকে আবু আমের ফাসেক নামের ঘোর বিরোধী এবং নৈরাজ্য সৃষ্টিকারী এক ব্যক্তি বলে, তোমরাও একটি মসজিদ নির্মাণ কর আর যথাসম্ভব এতে অস্ত্রশস্ত্রও জড়ো কর। তার উদ্দেশ্য ছিল এটিকে নৈরাজ্যের আখড়া বানানো। সে বলে, আমি রোমান সম্রাট কায়সারের কাছে যাচ্ছি আর সেখান থেকে একটি রোমান সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসবো এবং এরপর মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে এখান থেকে বের করে দিব।

মসজিদ নির্মাণের কাজ যখন সম্পন্ন হয় তখন তারা অর্থাৎ তাদের লোকেরা মহানবী (সা.) সকাশে উপস্থিত হয় এবং বলে- রুগ্ন ও প্রতিবন্ধীদের সুবিধার জন্য আমরা এই মসজিদ নির্মাণ করেছি, কেননা তারা নামায পড়ার জন্য বেশি দূরে যেতে পারে না আর একইসাথে তাঁর (সা.) সমীপে তারা এ নিবেদনও করে যে, এই মসজিদে নামায পড়ানোর জন্য আপনিও আসুন। মহানবী (সা.) বলেন, এখন আমি সফরের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, (কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন) ইনশাআল্লাহ্ যখন আমরা ফিরে আসবো তখন আমি নামায পড়ব। এটি ছিল তবুকের যুদ্ধের সফর। তবুকের যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে মহানবী (সা.) মদীনার অদূরে অবস্থিত 'যী অওন' নামক জায়গায় অবস্থান করেন, মদীনা থেকে যার দূরত্ব হলো এক ঘন্টার পথ। সে সময় মসজিদে যিরার সম্পর্কে তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়; যা পবিত্র কুরআনে সূরা তওবায় উল্লেখ রয়েছে আর তা হচ্ছে-

وَالَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَّ كُفْرًا وَّتَفْرِيْقًۢا بَيْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَاِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ مِنْ قَبْلُ ؕ وَلَيَحْلِفُنَّ اِنْ اَرَدْنَاۤ اِلَّا الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ

(সূরা আত্ তাওবা:১০৭)

অর্থাৎ, আর সেসব লোক যারা ক্ষতিসাধন, কুফরী প্রচার ও মু'মিনদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং এমন ব্যক্তিকে ঘাঁটি সরবরাহের জন্য একটি মসজিদ বানিয়েছে যে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে পূর্ব থেকেই যুদ্ধে লিপ্ত, তারা অবশ্যই কসম খেয়ে বলবে, আমরা কেবল কল্যাণই চেয়েছি। অথচ আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী।

মহানবী (সা.) এরপর মালেক বিন দুখশাম এবং মাআন বিন আদীকে ডাকেন আর তাদেরকে মসজিদে যিরার ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আসেম বিন আদী এবং আমর বিন সাকান আর ওয়াহ্শী {যে হযরত হামযা (রা.)-কে শহীদ করেছিল}এবং সুয়ায়েদ বিন আব্বাসকেও মহানবী (সা.) এই উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যুরকানীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে একথাও লেখা আছে যে, খুব সম্ভব মহানবী (সা.) প্রথমে দু'জনকে প্রেরণ করেছিলেন, পরে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য আরো চার জনকে প্রেরণ করেন। মহানবী (সা.) তাদেরকে মসজিদে যিরার ভেঙে ফেলার ও আগুন লাগিয়ে দেওয়ার জন্য মসজিদ অভিমুখে যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, তারা ক্ষিপ্রতার সাথে বনু সালেম গোত্রের কাছে পৌঁছেন, যা হযরত মালেক বিন দুখশাম এর গোত্র ছিল। তখন হযরত মালেক বিন দুখশাম হযরত মাআনকে বলেন, আমাকে কিছুটা সময় দাও যেন আমি ঘর থেকে আগুন নিয়ে আসতে পারি। অতএব তিনি ঘর থেকে খেজুরের শুকনো শাখায় আগুন ধরিয়ে নিয়ে আসেন। এরপর তারা মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে মসজিদে যিরারের কাছে পৌঁছান এবং সেখানে গিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দেন। এই ঘটনার কিয়দংশ ইতোপূর্বে হযরত মালেক বিন দুখশাম এর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছিলাম। যাহোক, তখন এই মসজিদের নির্মাতারা সেখানে উপস্থিত ছিল কিন্তু আগুন লাগানোর পর তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। মহানবী (সা.) যখন মদিনায় আগমন করেন,তখন ঘর নির্মাণের জন্য তিনি (সা.) মসজিদের এই জায়গাটি আসেম বিন আদীকে প্রদান করতে চান (অর্থাৎ যে সাহাবীর এখন স্মৃতিচারণ হচ্ছে)।কিন্তু আসেম বিন আদী বলেন, এই জায়গা আমি নিব না। এ অস্বীকৃতি তিনি এ জন্য জ্ঞাপন করেন যে,এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা যা অবতীর্ণ করতে চেয়েছিলেন করেছেন। অর্থাৎ- এটি তো এমন স্থানে নির্মিত হয়েছে যেখানে এটি নির্মাণ করা আল্লাহ্তা'লা পছন্দ করেন নি তাই আমি এই জায়গা নিতে চাই না। আসেম বিন আদী বলেন, আমার ঘরও আছে আর আমি দ্বিধাদ্বন্দেও রয়েছি, তাই ক্ষমা চাচ্ছি আর এটি সাবেত বিন আকরামকে প্রদান করা উত্তম হবে। কারণ তার ঘর নেই এবং তিনি এখানে নিজের ঘর বানাতে পারবেন। অতএব মসজিদে যিরারের যে জায়গা ছিল তা মহানবী (সা.) সাবেত বিন আকরামকে প্রদান করেন।

ইবনে ইসহাকের মতে মসজিদে যিরারের নির্মাতা মুনাফিকদের নাম হলো, খিযাম বিন খালেদ, মুয়াত্তেব বিন কুশায়ের, আবু হাবীবা বিন আযহার, আব্বাদ বিন হুনায়েফ, জারিয়া বিন আমের এবং তার দুই পুত্র মুজাম্মে বিন জারিয়া এবং যায়েদ বিন জারিয়া, নুফায়েল বিন হারেস, ইয়াকযাল বিন উসমান এবং ওয়াদীআ। যাহোক, এরা জোটবদ্ধ ছিল আবু আমের রাহেবের সাথে, মহানবী (সা.) যার নাম রেখেছিলেন ফাসেক।

(সুবুলুল হুদা ওয়াররুশাদ, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৭০-৪৭২) (শারাহ যুরকানি , ৪র্থ খণ্ড,পৃ: ৯৭-৯৮, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও একবার দিল্লী সফরে যান, তখন দিল্লীর জামে মসজিদ দেখে তিনি (আ.) বলেন, খুবই সুন্দর এক মসজিদ, তবে মসজিদের প্রকৃত সৌন্দর্য অট্টালিকার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয় বরং সেই নামাযীদের সাথে, যারা নিষ্ঠার সাথে নামায পড়ে। তিনি (আ.) বলেন, এসব মসজিদ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সে যুগেও বহু মসজিদ পরিত্যক্ত ছিল। তিনি (আ.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর মসজিদ খুবই ছোট ছিল, প্রথমদিকে খেজুরের শাখা দিয়ে তার ছাদ বানানো হয়েছিল আর বৃষ্টির সময় সেই ছাদ দিয়ে পানি পড়তো। তিনি (আ.) বলেন, মসজিদের সৌন্দর্য নামাযীদের ওপর নির্ভর করে। মহানবী (সা.)-এর যুগে জগৎপূজারীরাও একটি মসজিদ বানিয়েছিল, তা খোদার নির্দেশে ভেঙে ফেলা হয় আর সেটির নাম ছিল মসজিদে যিরার, অর্থাৎ কষ্টদায়ক মসজিদ। সেই মসজিদটি মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তিনি (আ.) বলেন, মসজিদ সম্পর্কে নির্দে শ হলো- তা যেন তাকওয়ার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়। (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃ: ১৭০)

অতএব, এটি হলো মসজিদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বর্তমানে মুসলমানদের একটি শ্রেণির মাঝে মসজিদ আবাদ করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, এই আগ্রহ বা মনোযোগও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের পর সৃষ্টি হয়েছে। কোন সুযোগ যদি সৃষ্টি হয়ে থাকে, উদ্দীপনা বা সাহস সৃষ্টি হয়েও থাকে অথবা ইবাদতের প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়েও থাকে কিংবা বাহ্যিক ইবাদতের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়েও থাকে, তবে তা-ও তাঁর দাবির পরই হয়েছে। খুবই সুন্দর মসজিদ তারা নির্মাণ করে এবং গুরুত্বের সাথে মসজিদ বানানোর পাশাপাশি সম্প্রতি বিশেষ করে পাকিস্তান ও অন্যান্য কতিপয় দেশে কিছুসংখ্যক লোক এটিকে আবাদ করার প্রতিও মনোযোগ দিচ্ছে। কিন্তু এসব মসজিদ তাকওয়া-শূন্য। আল্লাহ তা'লা মসজিদে যিরার ধ্বংস করে দেওয়ার যে নির্দেশ দিয়েছিলেন এর পরবর্তী আয়াতে এটিও খুবই স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, সেটিই প্রকৃত মসজিদ যার ভিত্তি তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু অ-আহমদী আলেমরা মনে করে যে, মসজিদে দাঁড়িয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করা আর তাঁর সম্বন্ধে নোংরা ও কঠোর ভাষা ব্যবহার করা ও জামাতকে গালি দেওয়াই হলো তাকওয়া । আর শুধু তা-ই নয় বরং প্রতিনিয়তই এমনসব ঘটনা দেখা যায় যে, এসব মসজিদের ইমামত ও বিভিন্ন দলের অর্ন্তদ্বন্দ্বের কারণে তাদের নিজেদের মাঝেও গালিগালাজ ও বিবাদ চলতে থাকে। এখন তো অধিকাংশ ঘটনাই ভাইরাল হয়ে যায় অর্থাৎ দেখা যায়, মসজিদে দাঙ্গা-ফাসাদ হচ্ছে এবং একে অপরকে গালিগালাজ করছে। সুতরাং এসব বিষয়ের মাধ্যমে এটিই সুস্পষ্ট হয় যে, এদের মাঝে তাকওয়ার ঘাটতি রয়েছে এবং তাদের মসজিদগুলোতে মসজিদের প্রকৃত প্রাপ্য প্রদান করা হচ্ছে না। তাদের কর্মকাণ্ড থেকে আহমদীদেরও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত এবং আমাদের চেষ্টা করা উচিত যেন আমাদের মসজিদগুলো তাকওয়ার ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। তাকওয়াকে দৃষ্টিপটে রেখেই আমরা যেন এসব মসজিদ আবাদ করার জন্য আসি। অতএব, এটিই হলো প্রকৃত সত্য বিষয়, যদি এটি বজায় থাকে এবং যতদিন এটি বজায় থাকবে, ইনশাআল্লাহ্ তা'লা ততদিনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার কল্যাণরাজির ওয়ারিস হতে থাকবো।

'লেমান হারাবাল্লাহা' প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হযরত খলীফাতুল

যুগ ইমাম-এর বাণী

কোনও ধর্ম, জাতি বা সম্প্রদায় আধ্যাত্মিকতা ব্যাতিরেকে টিকে থাকতে পারে না। **(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৬১)**

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

মসীহ্ আউয়াল (রা.) বলেন, এতে আবু আমেরের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে,যে খ্রিষ্টান ছিল। তার বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের মাঝে একটি ষড়যন্ত্র ছিল এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা.) যদি এই মসজিদে একবার নামায পড়েন তাহলে কিছু মুসলমান এদিকেও আসবে আর এভাবে মুসলমানদের জামাতকে আমি খণ্ড-বিখণ্ড করে ফেলব। এই আবু আমের নিজের একটি রুইয়া বা স্বপ্নও প্রচার করে রেখেছিল যে, আমি দেখেছি, মহানবী (সা.) 'ওয়াহীদান ত্বারীদান শারীদান' অর্থাৎ বিতাড়িত অবস্থায় (নাঊযুবিল্লাহ্) নিঃসঙ্গ-পরিত্যক্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবেন। তার এই কথা শুনে মহানবী (সা.) বলেছিলেন, স্বপ্নটি সত্য, সে ঠিক বলেছে। আসল কথা হলো, সে এতে নিজের অবস্থাই দেখেছে, আর এমনই হয়েছে। তিনি (সা.) কারো নাম উল্লেখ করেন নি- এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেন- নাম উল্লেখ না করার পেছনে প্রজ্ঞা হলো, ভবিষ্যতেও যদি কেউ এমনটি করে তাহলে তার পরিণতিও এমনই হবে।

(হাকায়েকুল ফুরকান, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১০)

আর আমরা দেখি যে, আজও শত্রুদের পরিণতি ঠিক এমনই হয়ে চলেছে।

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো, হযরত আমর বিন অউফ। হযরত আমরের নাম উমায়েরও বর্ণিত হয়েছে। তার পিতার নাম ছিল অউফ। তাঁর ডাক নাম ছিল আবু আমর। তিনি মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন আর ইবনে সা'দের মতে তিনি ইয়ামেনের অধিবাসী ছিলেন।

(আল আসাব ফি তামিযিস সাহাবা,৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৫২-৫৫৩)
(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩৫৪-৩৫৫)

ইতিহাসবিদ, জীবনীকার এবং হাদীসবিশারদগণ এই সাহাবীর নাম সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন আর তার সম্বন্ধে অনেক বেশি বিতর্ক রয়েছে। যেমন, ইমাম বুখারী, ইবনে ইসহাক, ইবনে সা'দ, আল্লামা ইবনে আব্দুল বার্ এবং আল্লামা ইবনে আসীর জাযরী প্রমুখ তার নাম 'আমর' বর্ণনা করেছেন। অথচ ইবনে হিশাম, মূসা বিন উকবা, আবু মা'শার, মুহাম্মদ বিন উমর ওয়াক্দী প্রমুখ তার নাম উমায়ের উল্লেখ করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনি এবং আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী উভয়ে সহীহ্ বুখারীর ভাষ্যকার, তারা লিখেছেন, তাদের মতে আমর বিন অওফ এবং উমায়ের বিন অওফ –নাম দু'টি একই ব্যক্তির ।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩১০) (উসদুল গাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২৪৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত, ২০০৩) (আল ইসতিয়াব ফি মারিফাতিল আসহাব, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৭৪)

ইমাম বুখারী'র মতে হযরত আমর বিন অওফ আনসারী কুরাইশদের বনু আমের বিন লোই গোত্রের মিত্র ছিলেন, অন্যদিকে ইবনে হিশাম এবং ইবনে সা'দ তাকে কুরাইশদের বনু আমের বিন লোই' গোত্রের সদস্য আখ্যা দিয়েছেন। বুখারী শরীফের ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী এগুলোর সংকলন করেছেন। তিনি বলেন, প্রকৃতপক্ষে হযরত আমর বিন অওফ আনসারদের অওস অথবা খাযরাজ গোত্রের সদস্য ছিলেন আর তিনি মক্কায় গিয়ে অবস্থান করেছিলেন আর সেখানে কতক লোকের মিত্র হয়েছিলেন। আর এই দিক দিয়ে তিনি আনসারও আবার মুহাজেরও।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জিযিয়া, দার আহইয়াউত তুরাস, বেরুত) (আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ৩১০)

হযরত আমর বিন অওফ প্রাথমিক পর্যায়ের ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের সময় তিনিকুবা'য় হযরত কুলসুম বিন হিদামের ঘরে অবস্থান করেন। হযরত আমর বিন অওফ বদর, উহুদ ও পরিখার পাশাপাশি অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.)-এর সহযোদ্ধা ছিলেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৫৪) (আল্ আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৬, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

তিনি ইন্তেকাল করেছেন হযরত উমরে'র খেলাফতকালে হয় আর হযরত ওমর তার জানাযার নামায পড়িয়েছিলেন।

(আল্ আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৫৩, দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত)

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত মাআন বিন আদী। হযরত মাআন আনসারদের বনু আমর বিন অওফ গোত্রের মিত্র ছিলেন।

(ইবনে হিশাম, পৃ: ২৯, দার ইবনে হাজাম, বেরুত, ২০০৯)

হযরত মাআন হযরত আসেম বিন আদী'র ভাই ছিলেন। পূর্বেই এ প্রেক্ষিতে তার উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত মাআন সত্তর জন আনসারের সাথে উকবার বয়আতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পূর্বে আরবীতে লিখতে জানতেন, অথচ সে যুগে আরবী লেখার প্রচলন খুবই কম ছিল। হযরত মাআন বদর, উহুদ এবং খন্দকসহ সকল যুদ্ধে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর সহযোদ্ধা ছিলেন। হযরত যায়েদ বিন খাত্তাব যখন মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করেন তখনমহানবী (সা.) হযরত মাআন বিন আদী এবং যায়েদ বিন খাত্তাবে'র মাঝে ভ্রাতৃত্ববন্ধন রচনা করেন।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৪৪, দার আহইয়াততুরাস, বেরুত)

হযরত উমর বর্ণনা করেন যে, যখন মহানবী (সা.) মৃত্যুবরণ করেন তখন আমি হযরত আবু বকর'কে বললাম, আপনি আমাদের সাথে আমাদের ভাই আনসারদের কাছে চলুন। অতএব আমরা গিয়ে তাদের মাঝে দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তিকে আমরা পাই যারা বদরে'র যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আমি উরওয়া বিন যুবায়েরকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন , তারা ছিলেন যথাক্রমে হযরত উয়ায়েম বিন সায়েদা এবং হযরত মাআন বিন আদী।

(সহী বুখারী কিতাবুল মাগাযি, শুহুদুল মালায়েকা বাদরান, হাদীস-৪০২১)

হযরত উমরে'র যে রেওয়ায়েত এখনই বর্ণিত হয়েছে, এর আরো বিস্তারিত বুখারীর অপর এক বর্ণনায়ও উল্লেখিত আছে যার কিছু অংশ আমি এখন উপস্থাপন করছি:-

হযরত ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, মুহাজেরদের অনেককে তিনি কুরআন পড়াতেন। তাদের মাঝে আব্দুর রহমান বিন অওফ'ও ছিলেন। একবার তিনি তার সেই ঘরে অবস্থান করছিলেন, যেটি মিনায় অবস্থিত আর তিনি উমর বিন খাত্তাবের কাছে গিয়েছিলেন। এটি হযরত উমরের শেষ হজ্জের ঘটনা। হযরত আব্দুর রহমান বিন অউফ তার কাছে ফিরে এসে বলেন, হায়! তুমিও যদি সেই ব্যক্তিকে দেখতে যে আজ আমীরুল মু'মিনিনের কাছে আসে এবং বলে, হে আমীরুল মু'মিনিন! আপনি কি অমুক ব্যক্তি সম্পর্কে অবগত হয়েছেন, যে বলে যে উমর মারা গেলে আমি অমুকে'র হাতে বয়আত করব, অর্থাৎ হযরত উমরে'র খেলাফতকালেই বলছে যে, তার পর আমি অমুকের হাতে বয়আত করব। এরপর সেই ব্যক্তি বলে, আল্লাহ্র কসম! আবু বকরের হাতে বয়আত তো এমনিতেই তাড়াহুড়োয় হয়ে গেছে। শুধু এটি নয় যে, পরবর্তী জনের কথা উল্লেখ করেছে বরং এটাও বলে বসেছে যে, হযরত আবু বকর (রা.)-এর বয়আত নাঊযুবিল্লাহ্ আপাতকালীন পরিস্থিতিতে ভুলবশত হয়েছিল আর এভাবেই নাকি তিনি খেলাফতের মর্যাদা লাভ করেছেন। এ কথা শুনে হযরত উমর দুঃখভারাক্রান্ত হন এবং তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা চাইলে আজ সন্ধ্যায় আমি মানুষের সামনে দণ্ডায়মান হব এবং তাদেরকে সেসব লোকের বিষয়ে সতর্ক করব যারা তাদের বিষয়কে জোর করে নিজেদের হাতে নিতে চায়। হযরত আব্দুর রহমান বলেন, আমি বললাম, হে আমীরুল মু'মিনীন! এমনটি করবেন না। কেননা হজ্জে সাধারণ মানুষ এবং দুষ্ট প্রকৃতির মানুষও সমবেত হয়ে থাকে। আপনি যখন মানুষের মাঝে কিছু বলার জন্য দাঁড়াবেন, তখন এরাই জোর করে আপনার কাছে ভিড়বে বা একত্রিত হবে। আর আমার আশংকা হয়, আপনি দাঁড়িয়ে এমন কোন কথা না বলে বসেন যে আপনি বলবেন কিছু আর অপপ্রচারকারীরা প্রচার করবে ভিন্ন কিছু(অর্থাৎ নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে অন্য কিছু প্রচার করবে আর মানুষ তা বুঝতেও পারবে না এবং যথাস্থানে তা প্রয়োগও করবে না)। অর্থাৎ কথা বুঝবেও না আর সঠিক স্থানে তা প্রয়োগও করতে পারবে না এবং এর সঠিক ব্যাখ্যা করাও সম্ভব হবে না। এভাবে তিনি হযরত উমর (রা.)-কে পরামর্শ প্রদান করেন আর বলেন, মদিনায় পৌঁছা পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করুন। তখন হজ্জের সময় ছিল। আপনি যদি মদিনায় পৌঁছে এমন কিছু বলেন, যা কিনা হিজরত এবং সুন্নতের স্থান, সেখানে যা হবে তা হলো,বুদ্ধিমান ও ভদ্র লোকদেরকে আলাদা করে তাদেরকে আপনার যা বলার তা প্রশান্ত চিত্তে বলুন। তিনি বলেন, আমি বললাম, জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনার কথা বুঝতে পারবে আর যথোপযুক্ত স্থানে তা প্রয়োগও করবে এবং নিজেদের মনগড়া ব্যাখ্যা করবে না। এতে হযরত উমর (রা.) বলেন, ঠিক আছে, খোদার কসম! ইনশাআল্লাহ্ সেখানে পৌঁছে প্রথমবার খুতবা প্রদানের জন্য যখন আমি মদিনায় দণ্ডায়মান হব, তখন এই কথাগুলো বর্ণনা করব। ইবনে আব্বাস বলেন, আমরা যিল হজ্জ মাসের শেষের দিকে মদিনায় পৌঁছি। জুমুআর দিন সূর্য ঢলে পড়তেই (অর্থাৎ জুমুআর সময় হতেই) আমরা দ্রুত মসজিদে এসে যাই। সেখানে পৌঁছেই আমি সাঈদ বিন যায়েদকে মিম্বরের পাশে বসা অবস্থায় দেখতে পাই এবং আমিও তার পাশে বসে যাই। আমার হাঁটু তার হাঁটু স্পর্শ করছিল (তিনি বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন)। স্বল্পক্ষণ অতিবাহিত হতেই হযরত উমর (রা.) খুতবার জন্য বের হন। আমি যখন তাকে সম্মুখ দিক থেকে আসতে দেখি, তখন আমি সাঈদ বিন যায়েদকে বলি যে, আজ তিনি এমন কথা বলবেন যা খলীফা হওয়ার পর থেকে কখনও বলেন নি। আমার কথা

তার কাছে অদ্ভুত মনে হয় (অর্থাৎ যিনি তার পাশে বসে ছিলেন তার কাছে সেকথাগুলো অদ্ভুত ঠেকে)। তিনি বলেন, আমি মনে করি না যে, তিনি এমন কথা বলবেন যা এর পূর্বে তিনি বলেন নি।

হযরত উমর মিম্বরে বসেন। মুয়াযযিন আযান শেষ করলে তিনি দণ্ডায়মান হন আর আল্লাহ্‌র সেই প্রশংসা করেন, যার তিনি যোগ্য। অতঃপর বলেন, আমি তোমাদেরকে এমন একটি কথা বলতে যাচ্ছি যা আমার জন্য বলা অবধারিত ছিল। আমি জানি না , এই কথা আমার মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী কথা কি না। তাই যে ব্যক্তি এ কথাকে বুঝবে এবং ভালোভাবে স্মরণ রাখবে, এমন ব্যক্তির উটনী তাকে যেখানেই পৌঁছে দেয় সে যেন সেই কথা বর্ণনা করে (অর্থাৎ এই কথাকে যেখানে পৌঁছানো সম্ভব সেখানেই যেন অন্যের মাঝে সঠিকভাবে পৌঁছে দেয়) আর যার এই সন্দেহ হয় যে, সে এই কথা বুঝে নি, সে ক্ষেত্রে আমার সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মিথ্যা বলাকে আমি বৈধ মনে করি না (অর্থাৎ ভ্রান্ত কথা প্রচার করবে না)। অতঃপর তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ (সা.)-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর ওপর শরীয়তের আদেশ-নিষেধ অবতীর্ণ করেছেন। এরপর শরীয়তের কতক আদেশ-নিষেধের কথাও উল্লেখ করেন। এটি এক দীর্ঘ বর্ণনা এবং হাদীস, এটিকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। অতঃপর তিনি বলেন, শোন! মহানবী (সা.) এরপর এটিও বলেছিলেন যে, যেভাবে ঈসা ইবনে মরিয়মের প্রশংসায় অতিরঞ্জনের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে, সেভাবে আমার অতিরঞ্জিত প্রশংসা করো না। মহানবী (সা.) বলেছিলেন, বরং তোমরা আমার সম্পর্কে এটিই বল যে, তিনি আল্লাহ্‌র বান্দা এবং তাঁর রসূল। অতঃপর হযরত উমর (রা.) বলেন, আমার কাছে এই সংবাদ এসেছে যে, তোমাদের মধ্যে কেউ একজন বলে, আবু বকর (রা.) তো এমনিতেই খিলাফত পেয়ে গেছেন। সেই ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.) সম্বন্ধেও এবং আমার সম্বন্ধেও বলেছে যে, খোদার কসম! উমর যদি মারা যায় তবে আমি অমুক ব্যক্তির হাতে বয়আত করবো। তিনি কথা প্রথমে হযরত আবু বকর (রা.)-এর দিকে নিয়ে গেছেন পরবর্তীদের বিষয় তো পরে আসবে। এ বিষয়টি আমি স্পষ্ট করছি, কোন ব্যক্তি আত্মপ্রতারণার বশবর্তী হয়ে যেন এ কথা না বলে যে, আবু বকর (রা.)-এর বয়আত এমনিতেই আপাতকালীন পরিস্থিতিতে ভুলে হয়ে গিয়েছিল আর এভাবে তিনি খলীফা হয়ে যান। শোন! এটি সঠিক যে, সেই বয়আত এভাবেই হয়েছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাড়াহুড়োর বয়আতের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করেছেন। তা তাড়াহুড়োর অবস্থায় হয়ে থাকলে হয়ে থাকবে, এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু এর ক্ষতি থেকে আল্লাহ্ তা'লা রক্ষা করেছেন। আর তোমাদের মাঝে আবু বকর (রা.)-এর মতো দ্বিতীয় কেউনেই যার কাছে উটে চড়ে মানুষ আসবে। অর্থাৎ এমন পুণ্যকর্মশীল আলেম, নিষ্ঠাবান এবং তাক্বওয়ার উন্নত মানে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি অন্য কেউ ছিল না। এরপর অন্যান্য কথার কিছু বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়াই কোন ব্যক্তির বয়আত গ্রহণ করে তার হাতে যেন বয়আত করা না হয় অর্থাৎ, যে বয়আত হয়েছিল তা যথার্থ পরামর্শের মাধ্যমেই হয়েছিল। আর এটিও স্মরণ রেখ, যে ব্যক্তি মুসলামানদের পরামর্শ ছাড়াই কোন ব্যক্তির বয়আত গ্রহণ করে তার বয়আত যেন না করা হয় এবং সেই ব্যক্তিরও (হাতে যেন বয়আত না করা হয়) যে কিনা তার হাতে বয়আত করেছে এটি এজন্য যে সে যেন নিজেকে ধ্বংস না করে ফেলে।

এরপর হযরত উমর (রা.) প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করেন যে, সত্যিকার অর্থে আমাদের ঘটনা মূলত এটি হয়েছিল যে আল্লাহ্ তা'লা যখন মহানবী (সা.)-কে মৃত্যু দেন তখন আনসারগণ আমাদের বিরোধী হয়ে যায় এবং আমরা সবাই সাকীফা বনূ সায়েদা-য় একত্রিত হই। হযরত আলী এবং যুবায়ের আর যারা তাদের সাথে ছিল তারা সবাই আমাদের বিরোধী ছিল। মুহাজিরগণ একত্রিত হয়ে হযরত আবু বকর (রা.)-এর কাছে আসে। আমি আবু বকর (রা.)-কে বললাম, হে আবু বকর (রা.)! চলুন, আমরা আনসার ভাইদের নিকট যাই। তাদের সেই ঘটনা বর্ণনা করতে করতে এবং সেই কথা বলতে বলতে আমরা যাচ্ছিলাম যে, তারা কী সব কথা বলছে? আমরা যখন তাদের নিকটে পৌঁছি তখন তাদের মধ্যকার দু'জন পুণ্যবান ব্যক্তির সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়। আমি প্রথমে যে রেওয়ায়াতটি বর্ণনা করেছিলাম, সে অনুযায়ী যে দু'জন পুণ্যবান পুরুষ ছিলেন তাদের মধ্যে একজন হলেন, হযরত মাআন বিন আদী। যাহোক, তিনি বলেন-যে পরামর্শের উপর সেসব লোক (অর্থাৎ আনসারগণ) ঐক্যবদ্ধ হয়ে বসেছিল, পথে আমাদের সাথে সাক্ষাৎ হওয়া সেই দুই ব্যক্তি আনসারদের কথা উল্লেখ করে এবং তারা জিজ্ঞেস করে, হে মুহাজেরদের দল! তোমরা কোথায় যেতে চাচ্ছ? আমরা বললাম, আমরা সেসব আনসার ভাইয়ের সাথে দেখা করতে চাই। তখন সেই দু'জন (অর্থাৎ যাদের সাথে পথে দেখা হয়েছিল, যাদের মাঝে হযরত মাআন বিন আদী-ও ছিলেন,তারা) বলেন, কোন অবস্থাতেই সেখানে যেও না। তাদের কাছে না যাওয়াই তোমাদের জন্য উত্তম। তোমরা যা পরামর্শ করতে চাও, নিজেরাই করে নাও। হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি বললাম, আল্লাহ্‌র কসম! আমরা অবশ্যই তাদের কাছে যাবো আর আমরা এটি বলে রওয়ানা হই আর বনু সায়েদার শামিয়ানায় তাদের কাছে পৌঁছি।

(সহী আল বুখারী, কিতাবুল হদুদ, হাদীস-৬৮৩০)

সেখানে হযরত আবু বকর (রা.) ওহযরত উমর (রা.)-এর সাথে আনসারদের একটি দীর্ঘ বিতর্ক হয়, আর যে আলোচনা হয়েছিল তা খিলাফতের নির্বাচন সম্বন্ধে ছিল। এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে যার কিছুটা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, এখন আমি তা উপস্থাপন করছি।

সেই সাকীফা বনু সায়েদার ঘটনা যেখানে আনসাররা বসেছিল, সেই ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালে সাহাবীরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন। একদল এটি মনে করল যে, মহানবী (সা.)-এর পরে এমন এক ব্যক্তি অবশ্যই হওয়া উচিত যে কিনা ইসলামী ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করবে। কিন্তু নবীদের ইচ্ছাকে যেহেতু তাদের পরিবার ও বংশধরগণই ভালোভাবে বুঝতে পারবেন তাই মহানবী (সা.)-এর বংশের মধ্য থেকেই কোন ব্যক্তিকে নির্ধারণ করা উচিত। একটি দল এটি বলছিল যে, তাঁর (সা.) সন্তানদের মাঝ থেকেই কেউ মনোনীত হওয়া উচিত অন্য কোন পরিবার থেকে নয়। এই দলটির ধারণা ছিল যে, অন্য কোন পরিবার থেকে যদি কোন ব্যক্তি খলীফা মনোনীত হয়, তাহলে মানুষ তার কথা মানবে না আর এভাবে ব্যবস্থাপনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। সন্তান বলতে আপন সন্তান বা তাঁর (সা.) নিকটাত্মীয় যেমন জামাতা প্রভৃতিও হতে পারেন। কিন্তু যদি তাঁর (সা.) পরিবার থেকেই কেউ খলীফা নির্ধারিত হন, তাহলে যেহেতু মানুষ এই পরিবারের আনুগত্যে অভ্যস্ত, তাই তারা সানন্দে তার আনুগত্য স্বীকার করে নিবে। যেমন একজন সম্রাটের কথা মান্য করতে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়; যখন সে মৃত্যুবরণ করে আর তার ছেলে তার স্থলাভিষিক্ত হয়, তখন তার আনুগত্যও মানুষ সানন্দে স্বীকার করে নেয়।

কিন্তু দ্বিতীয় যে দলটি ছিল তারা ভাবল যে, এর জন্য কারো রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পরিবারভুক্ত হওয়ার শর্তটি থাকা আবশ্যক নয়। উদ্দেশ্য হলো মহানবী (সা.)-এর একজন স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত হওয়া তাই যিনি এর সবচেয়ে যোগ্য, তার উপরই এই দায়িত্ব অর্পিত হওয়া উচিত। এই দ্বিতীয় দলের আবার দু'টো ভাগ হয়ে যায়; আর যদিও দু'দলই এই বিষয়ে একমত ছিল যে, মহানবী (সা.)-এর একজন স্থলাভিষিক্ত হওয়া উচিত, কিন্তু তাদের মাঝে এটি নিয়ে দ্বিমত সৃষ্টি হয় যে, মহানবী (সা.)-এরএই স্থলাভিষিক্ত কাদের মধ্য থেকে হবেন। এক দলের মত ছিল– যারা সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর (সা.) শিক্ষাধীন ছিলেন, তারা এর যোগ্য; অর্থাৎ মুহাজেরগণ, আর তাদের মধ্য থেকেও কেবল কুরাইশ বংশোদ্ভূত কেউ, যার কথা মানার জন্য আরব প্রস্তুত হতে পারে। আর কতক ভাবল যে, যেহেতু মহানবী (সা.)-এর মৃত্যু মদিনায় হয়েছে এবং মদিনায় আনসারদের কর্তৃত্ব রয়েছে, তাই তারা-ই এই দায়িত্ব উত্তমরূপে পরিচালনা করতে পারবেন। যাহোক, এটি নিয়ে আনসার ও মুহাজিরদের মাঝে মতভেদও হয়েছে। মোটকথা, এভাবে আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। আনসারদের ধারণা ছিল, যেহেতু মহানবী (সা.) তাঁর আসল জীবন, যা ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পর্কিত, তা আমাদের মধ্যে অতিবাহিত করেছেন (অর্থাৎ মদিনায় অতিবাহিত করেছেন) আর মক্কায় কোন ব্যবস্থাপনা ছিল না–তাই শাসনব্যবস্থা আমরাই ভালোভাবে বুঝতে পারি এবং খিলাফতের বিষয়ে আমাদেরই অধিকার বর্তায়, অন্য

দোয়াপ্রার্থী: Sk Hatem Ali, Uttar Hajipur, Diamond Harbour

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্‌র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: Anowar Ali, Jamat Ahmadiyya Abhaipuri (Assam)

কারো নয়। দ্বিতীয় যে যুক্তি তারা দিত তা হলো, এই এলাকা আমাদের এবং স্বাভাবিকভাবে মানুষের উপর আমাদের কথারই বেশি প্রভাব পড়তে পারে, মুহাজিরদের নয়। তাই মহানবী (সা.)-এর স্থলাভিষিক্ত আমাদের মধ্য থেকে হওয়া উচিত, মুহাজিরদের মধ্য থেকে নয়।

এর বিপরীতে মুহাজিররা বলছিলেন, মহানবী (সা.)-এর দীর্ঘ সাহচর্য আমরা যতটা লাভ করেছি, ততটা দীর্ঘ সাহচর্য আনসাররা লাভ করে নি (এতটা সময় তারা তাঁর (সা.) সাথে থাকে নি) তাই ধর্ম বুঝার যে যোগ্যতা আমাদের রয়েছে, তা আনসারদের নেই। তিনি (রা.) লিখেন, এই দ্বিমত নিয়ে অন্যরা সবেমাত্র চিন্তা শুরু করেছে এবং তারা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে নি- এমন সময় শেষোক্ত দলটি, যারা আনসারদের পক্ষে ছিল, বনু সায়েদার এক বারান্দায় একত্রিত হয়ে এই বিষয়ে পরামর্শ শুরু করে দেয়; আর সাদ বিন উবাদা, যিনি খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন এবং নকীবদের একজন ছিলেন, তার ব্যাপারে সবাই বলতে আরম্ভ করে যে, তাকে খলীফা মনোনীত করা হোক। অতএব আনসাররা নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনায় বলে, দেশ আমাদের, জমিজমাও আমাদের, বিষয়-সম্পত্তিও আমাদের, আর ইসলামের মঙ্গলও এরই মাঝে নিহিত যে, আমাদের মধ্য থেকে কেউ খলীফা মনোনীত হোক। তারা সিদ্ধান্ত নেয় যে, এই পদের জন্য সাদ বিন উবাদার চেয়ে উত্তম আর কোন ব্যক্তি নেই। এই আলাপচারিতা চলাকালীন কেউ কেউ বলল, যদি মুহাজিররা তাকে অস্বীকার করে তাহলে কী হবে?- এরকম প্রশ্ন উঠল। এতে কেউ বলল, তখন আমরা বলব- 'মিন্না আমীরুন ও মিনকুম আমীর' অর্থাৎ একজন আমীর হোক তোমাদের মধ্য থেকে আর একজন আমীর হোক আমাদের মধ্য থেকে। এতে সাদ, যিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন, যাকে আনসাররা আমীর তথা খলীফা বানাতে চাইছিল, তিনি বললেন, এটা তো প্রথম দুর্বলতা (অর্থাৎ একজন খলীফা আমাদের মধ্য থেকে আর অপরজন তোমাদের মধ্য থেকে-এটি প্রথম দুর্বলতা)।'মিন্না আমীরুন ওয়া মিনকুম আমীর' বলা তো খেলাফতের মর্মার্থ না বুঝারই নামান্তর আর এতে ইসলামে বিপত্তি দেখা দেবে। এই পরামর্শ সভার পর মুহাজেরগণ যখন এ সম্বন্ধে জানতে পারেন তখন তারা দ্রুত সেখানে পৌঁছেন। [যেমনটি হযরত উমর (রা.) বলেছেন আর যা পূর্বে বর্ণিত হয়েছে; অর্থাৎ তিনি, হযরত আবু বকর (রা.) ও আরো কিছু লোক সেখানে যান]। কেননা তারা এ কথা জানতেন যে, মুহাজেরদের মধ্য থেকে কেউ খলীফা না হলে আরবরা তার আনুগত্য করবে না আর এটি কেবল মদিনার বিষয় নয় বরং পুরো আরবের বিষয়। মদিনায় নিঃসন্দেহে আনসারদের আধিপত্য ছিল কিন্তু পুরো আরব মক্কাবাসীদের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানে বিশ্বাসী ছিল। সুতরাং মুহাজেরগণ মনে করলেন, এই সময় যদি আনসারদের মধ্য থেকে কেউ খলীফা নির্বাচিত হন, তবে আরববাসীদের জন্য কঠিন সমস্যা দেখা দেবে আর এটিও সম্ভব যে, তাদের অধিকাংশই এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হবে না। সুতরাং সকল মুহাজের যখন সেখানে উপস্থিত হন যাদের মধ্যে হযরত আবু বকর, হযরত উমর এবং হযরত আবু উবায়দাও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন; হযরত উমর (রা.) বলেন, বর্ণনা করার জন্য তখন আমি অনেক বড় একটি বিষয় চিন্তা করে রেখেছিলাম আর আমার ইচ্ছা ছিল যে, আমি সেখানে গিয়েই এমন একটি বক্তৃতা দেবো, যা শুনে সকল আনসার আমার যুক্তি মেনে নিবে আর তারা এই কথা বলতে বাধ্য হবে যে, আনসারদের পরিবর্তে মুহাজেরদের মাঝ থেকে কাউকে খলীফা নির্বাচিত করা হোক। কিন্তু আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম তখন হযরত আবু বকর (রা.) বক্তৃতার জন্য দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি তখন মনে মনে ভাবলাম, তিনি আর কী-বা বলবেন। কিন্তু খোদার কসম আমি যত কথা ভেবেছিলাম হযরত আবু বকর (রা.) সেই সমস্ত কথা বলে দেন বরং এছাড়াও নিজের পক্ষ থেকে তিনি বেশ কিছু যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি হযরত আবু বকরের মোকাবেলা করার সামর্থ তখন রাখি না।এককথায় মুহাজিরগণ তাদেরকে বলেন যে, এই মুহূর্তে কুরাইশদের মধ্য থেকেই আমীর হওয়া আবশ্যক এবং মহানবী (সা.)-এর এই হাদীসটিও তিনি উপস্থাপন করেন যে, আল আইম্মাতু মিন কুরাইশ অর্থাৎ কুরাইশদের মধ্য থেকেই তোমাদের ইমাম হওয়ার কথা। একই সাথে ঈমান আনয়নের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রগামীতা এবং ধর্মের খাতিরে তারা যে কোরবানী করে আসছেন তাও উল্লেখ করেন। তখন হুব্বাব বিন মুনযের খাযরাজী দ্বিমত পোষণ করে বলেন, আমরা এই কথা মানি না যে, মুহাজেরদের মধ্য থেকে খলীফা হওয়া উচিত। তবে আপনারা যদি কোনভাবেই একমত না হন এবং এই কথার উপর আপনারা যদি জোর দেন তাহলে একজন আমীর হোক আপনাদের মাঝ থেকে আর একজন হোক আমাদের মধ্য থেকে। (এই কথার ওপর আমল করা যেতে পারে যে একজন খলীফা আমাদের মধ্য থেকে হবে আর একজন আপনাদের মধ্য থেকে।) হযরত উমর (রা.) বলেন, ভেবেচিন্তে কথা বল। তুমি কি জানো না যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, একই সময়ে দু'জন আমীর হওয়া কোনভাবে বৈধ নয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, এ থেকে বুঝা যায় যে, এমন হাদীসও বিদ্যমান ছিল যাতে মহানবী (সা.) খিলাফতের ব্যবস্থাপনার ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু তাঁর জীবদ্দশাতে সাহাবীদের মনোযোগ সেদিকে আকৃষ্ট হয় নি, আর এর নেপথ্য কারণ ছিল সেই ঐশী প্রজ্ঞা যার উল্লেখ হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজের এই বর্ণনায় প্রদান করেছেন যা এই মুহূর্তে উল্লেখ করা হচ্ছে।

যাহোক, হযরত উমর (রা.) বলেন, তোমার এই দাবি যে, একজন আমীর তোমাদের মধ্য থেকে হোক আর একজন আমাদের মধ্য থেকে; যুক্তি ও শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি কোনভাবেই বৈধ নয়।

এরপর হযরত আবু বকর (রা.)-এর নির্বাচন কিভাবে হলো? কিছু তর্ক-বিতর্কের পর হযরত আবু উবায়দা দণ্ডায়মান হন এবং তিনি আনসারদের মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন, তোমরা সেই প্রথম জাতি, যারা মক্কার বাহিরে ঈমান এনেছে। এখন মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পরে তোমরা সেই প্রথম জাতিতে পরিণত হয়ো না, যারা ধর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ভুলে যাবে। তিনি বলেন, সকল প্রকৃতির মানুষের ওপর এই বক্তব্যের এমন প্রভাব পড়ে যে, বশীর বিন সাদ খাযরাজী উঠে দাঁড়ান এবং স্বজাতির উদ্দেশ্যে বলেন, তারা সত্য কথা বলেছেন, আমরা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যে সেবা করেছি এবং তাঁকে যে সাহায্য সহযোগিতা করেছি, তা কোন পার্থিব উদ্দেশ্যে করি নি আর এ কারণেও করি নি যে, তাঁর পর আমরা রাজত্ব লাভ করব। বরং আমরা খোদা তা'লার খাতিরে করেছিলাম। অতএব এখানে অধিকারের প্রশ্ন নয় যে অধিকার আমাদের, আমরা আমীর হবো বা আমাদের মধ্য থেকে খলীফা হবে! বরং এটি ইসলামের প্রয়োজনের প্রশ্ন। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকে মুহাজেরদের মধ্য থেকেই আমীর নিযুক্ত হওয়া উচিত, কেননা তারা মহানবী (সা.) এর দীর্ঘ সাহচর্য লাভ করেছেন। এতে আরো কিছুক্ষণ তর্ক-বিতর্ক হতে থাকে। কিন্তু পরিশেষে আধা বা পৌনে এক ঘন্টা পর মানুষ একথার পক্ষে মত দিতে থাকে যে, মুহাজেরদের মধ্য থেকেই কাউকে খলীফা নিযুক্ত করা উচিত। সুতরাং এই পদের জন্য হযরত আবু বকর (রা.), হযরত উমর (রা.) ও হযরত আবু উবায়দা (রা.) এর নাম প্রস্তাব করেন। হযরত আবু বকর (রা.) স্বয়ং এটি উপস্থাপন করেন যে, হযরত উমর বা হযরত আবু উবায়দা-র মধ্য থেকে কারো হাতে বয়আত করা উচিত। কিন্তু উভয়েই অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন, যাকে মহানবী (সা.) স্বীয় অসুস্থতার সময় নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেছিলেন এবং যিনি সকল মুহাজেরদের মাঝে উত্তম আমরা তাঁর হাতেই বয়আত করব।

হযরত আবু বকর যে হযরত উমর এবং হযরত আবু উবায়দা-র নাম খিলাফতের জন্য প্রস্তাব করেন সে সম্পর্কে হযরত উমর (রা.) স্বয়ং তাঁর কথার ধারাবাহিকতায় বলেন, হযরত আবু বকর (রা.) জোরালো বক্তৃতা করেন, সব কথাই তার অনেক উন্নত মানের ছিল, তবে এই একটি কথা ছাড়া (অর্থাৎ হযরত উমর ও আবু উবায়দার নাম উপস্থাপনের বিষয়টি ছাড়া) আমি আর কোন কথা অপছন্দ করি নি। তিনি বলেন, খোদার কসম! হযরত আবু বকর যখন আমার নাম উপস্থাপন করেন তখন আমার অবস্থা এমন ছিল যে, মৃত্যু যাতে আমাকে পাপের কাছে যাওয়া হতে রক্ষা করে, এই মানসে আমাকে সামনে নিয়ে গিয়ে যদি আমার শিরচ্ছেদ করা হতো তাহলেও এটি আমার কাছে অধিক পছন্দনীয় ছিল এর চেয়ে যে, আমি এমন জাতির আমীর হব যাদের মাঝে হযরত আবু বকর রয়েছেন অর্থাৎ তাঁর

শেষাংশ ১০ পাতায়...

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa, Amir Murshidabad District

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের আনুগত্যের মানকে উন্নত করা মোমেনদের জন্য একান্ত জরুরী।

(খুতবা জুমা প্রদত্ত ২৪শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

রসুল করীম(সা.)-এর দাওয়াতে ইলাল্লাহ (শেষ পর্ব)

সকালে সূর্যোদয়ের পর যখন এই খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান হাত থেকে চলে গেছে, তখন তারা কয়েকজনকে বন্দরকে দিকে পাঠিয়ে দিল। কিন্তু তখন কিছুই করার ছিল না। সেই সকল সৌভাগ্যবান মুসলমানদেরকে নিয়ে জাহাজ দুটি সমুদ্রে পাড়ি দিয়ে দিয়েছিল। মক্কার বড় বড় নেতারা মনে করল "মুসলমানদের একটি দলকে মক্কা থেকে বের করে দেওয়া আমাদের সফলতা বলে গণ্য হতে পারে না। বরং এটি আমাদের পরাজয়ের প্রতীক। কেননা এরফলে ইসলামের দু'টি কেন্দ্র স্থাপিত হল এবং মক্কা থেকে বেরিয়ে একটি জাতির পরিবর্তে দু'টি জাতির মধ্যে প্রচার আরম্ভ হয়ে গেল। অর্থাৎ মক্কাবাসীদের মধ্যে এবং খৃষ্টানজাতির মধ্যে। এর সাথেই তাদের কাছে যখন এই সংবাদ পৌঁছাল যে, তারা শান্তিতে আছে, তাদেরকে কেউ মারেও না আর কোন প্রকারের যাতনাও দেয় না বরং তারা স্বচ্ছন্দে ইবাদত করে এবং পরিশ্রম করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করে, তখন নিজেদের মধ্যে বলাবলি শুরু করল, বিরাট ভুল হয়ে গেছে।"

(তফসীরে কবীর, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩)

সুতরাং তারা নিজেদের ভুল সংশোধন করার জন্য উমর বিন আল আস এবং আব্দুল্লাহ বিন রাবিয়া-কে নাজাশি ও তাঁর দরবারীদের জন্য প্রচুর উপঢৌকন সহকারে হাবশার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করল যাতে তারা কোন না কোন ভাবে নাজাশিকে সম্মত করে মক্কার মুহাজিরদের ফিরিয়ে নিয়ে আসে। সেই প্রতিনিধি দল সেখানে গিয়ে সভা পরিষদবর্গকে উপহার সামগ্রী দিয়ে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসে এবং এইভাবে তারা নাজাশী বাদশাহ পর্যন্ত পৌঁছানোর পথ তৈরী করে। বাদশা তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় দিলে এই প্রতিনিধি দলটি স্বমহিমায় দরবারে উপস্থিত হয় এবং বাদশার সমীপে মূল্যবান উপহার সামগ্রী পেশ করে। অবশেষে তারা নিজেদের আগমণের উদ্দেশ্যটি প্রকাশ করে।

"হে সম্রাট! আমাদের কয়েকজন নির্বোধ লোক নিজেদের পূর্বপুরুষের ধর্ম ত্যাগ করে একটি নতুন ধর্মের উদ্ভাবন করেছে যা আপনার ধর্মেরও বিরোধী। তারা আমাদের দেশে নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে রেখেছে। তাদের মধ্য থেকে কয়েকজন সেখান থেকে পালিয়ে এখানে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। আমাদের আবেদন,আপনি তাদেরকে আমাদের সঙ্গে ফেরত পাঠিয়ে দিন।"

সভা পরিষদবর্গ সঙ্গে সঙ্গে তাদের সমর্থন করতে আরম্ভ করে। কিন্তু বাদশাহ অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেন এবং আবেদন শুনেই একতরফা সিদ্ধান্ত দেওয়ার পরিবর্তে বললেন-

" এরা আমার আশ্রয়ে এসেছে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি স্বয়ং তাদের কথা না শুনি কিছু বলা সম্ভব নয়। "

সুতরাং মুসলমান মুহাজিরদেরকে সভায় ডাকা হয়। তাদেরকে নাজাশি বাদশা জিজ্ঞাসা করেন-

" ব্যাপারটি কি এবং তোমরা কি কোন নতুন ধর্মের উদ্ভাবন করেছে? "

মুসলমানদের পক্ষ থেকে আঁ হযরত (সা.)-এর চাচাতো ভাই হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রা.) উত্তর দিলেন-

"হে বাদশাহ! আমরা অজ্ঞ ছিলাম। মূর্তিপূজাই ছিল আমাদের ধর্ম। মৃত জন্তু ভক্ষণ করতাম। ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিলাম। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করতাম। প্রতিবেশীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করতাম। আমাদের মধ্যে যারা শক্তিশালী ছিল তারা দুর্বলদের অধিকার আত্মসাৎ করত। এমন পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'লা আমাদের দিকে একজন রসুল প্রেরণ করলেন যাঁর পবিত্রতা, সত্যতা এবং বিশ্বসনীয়তা সম্পর্কে আমরা সকলে অবগত ছিলাম। তিনি আমাদেরকে একত্ববাদ শিখিয়েছেন এবং মূর্তিপূজা করা থেকে নিরস্ত করেছেন। তিনি আমাদেরকে সত্য কথা বলার, বিশ্বস্ততা রক্ষা করার, আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখার এবং প্রতিবেশীর সঙ্গে উত্তম আচরণ করার শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ব্যাভিচার ও অনাথদের সম্পদ আত্মসাৎ করা থেকে নিষেধ করেছেন এবং খুনাখুনি করা থেকে বিরত রেখেছেন। তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্‌র ইবাদত করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা তাঁর উপর ঈমান এনেছি এবং তাঁকে অনুসরণ করেছি। কিন্তু এই কারণে জাতি আমাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। এরা আমাদেরকে যাবতীয় প্রকারের কষ্ট ও নির্যাতনের মধ্যে ফেলে দিয়েছে। আমাদের বিভিন্ন উপায়ে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে এই ধর্ম থেকে জোর করে বাধা দিতে চেয়েছে। অবশেষে আমরা অতিষ্ঠ হয়ে দেশ ত্যাগ করে আপনার দেশে এসে আশ্রয় নিয়েছি। অতএব হে বাদশাহ! আমরা আশা করি আপনার অধীনে আমাদের উপর জুলুম হবে না। "

নাজাশি এই কথা শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং হযরত জাফর (রা.)-কে প্রশ্ন করলেন;-

" যে বাণী তোমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে সেটি আমাকে শোনাও।"

হযরত জাফর (রা.) অত্যন্ত সুললতি কণ্ঠে সুরা মরিয়মের প্রারম্ভিক আয়াত পাঠ করে শোনান।

হযরত জাফর এমন বেদনাতুর কণ্ঠে এই আয়াতগুলি তিলাওয়াত করলেন যে, নাজাশির চোখ দিয়ে অশ্রু ধারা ঝরে পড়ল। তিনি কেবল কণ্ঠস্বরের প্রভাবে বিগলিত হন নি বরং উক্ত আয়াতসমূহে বর্ণিত ঘটনায় ইসলামী ধর্মবিশ্বাস এবং হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গির কারণেও তিনি প্রভাবিত হয়েছিলেন। বাদশাহ বললেন-

" খোদার কসম! এই বাণী এবং আমাদের মসীহ্‌র বাণী একই জ্যোতির উৎসের কিরণ বলে প্রতিভাত হয়।"

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃষ্ঠা: ১৫৪)

বাদশাহ কুরায়েশদের দেওয়া উপহার তাদেরকে ফিরিয়ে দিলেন এবং মুসলমানদেরকে তাদের হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করলেন। প্রতিনিধি দলটি বিমর্ষ মুখে ফিরে গেল, কিন্তু তারা হার মানল না। পরের দিন সভায় পুনরায় উপস্থিত হল। এবার উমর বিন আস বলল-

বাদশাহ কি একথা জানেন যে এরা হযরত মসীহ সম্পর্কে কি বলে?

বাদশাহ একতরফা সিদ্ধান্ত দেওয়ার পরিবর্তে মুসলমানদের মুখ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট করে নেওয়াকে উত্তম মনে করলেন। তিনি মুসলমানদের ডেকে পাঠালেন।

বাদশার পক্ষ থেকে ডাক শুনে মুসলমানরা কিছুটা চিন্তিত হল, কেননা তারা হযরত মসীহ (আ.)-কে সাধারণ মানুষ জ্ঞান করত, খোদার পুত্র বলে স্বীকার করত না। কিন্তু মুসলমানরা সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা নিজেদের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে সত্য কথাই বলবে। একমাত্র খোদা তা'লাকে ভয় করা উচিত এবং তাঁর উপরই আস্থা রাখা উচিত। সুতরাং তারা পরের দিন সভায় উপস্থিত হলে হযরত জাফর বিন তায়ার (রা.) দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে নিজেদের ধর্মবিশ্বাস উপস্থাপন করলেন।

" হে বাদশাহ! আমাদের ধর্মবিশ্বাস অনুসারে হযরত মসীহ (আ.) খোদা তা'লার একজন বান্দা, তিনি খোদা নন। কিন্তু তিনি খোদার অত্যন্ত নৈকট্যভাজন এক রসূল এবং তিনি আল্লাহ্‌ তা'লার সেই বাণীর দ্বারা অস্তিত্ব লাভ করেছেন যা তিনি মরিয়মের মধ্যে ফুৎকার করেছিলেন।"

নাজাশি একটি তৃণখণ্ড হাতে উঠিয়ে বললেন-

খোদার কসম! যা কিছু তুমি বর্ণনা করেছ, আমি হযরত মসীহ (আ.)-কে তার থেকে এই তৃণখণ্ডের সমানও অধিক মনে করি না।

নাজাশির এই বিবৃতি শুনে খৃষ্টান পাদরী অত্যন্ত ক্ষুন্ন হল। বাদশাহ্‌ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বললেন-

যখন আমার পিতা মারা যায় তখন আমি ছোট ছিলাম। তোমরা আমার চাচার সঙ্গে মিলিত হয়ে এই সাম্রাজ্যকে দখল করতে চেয়েছিলে। সেই সময় খোদা অনুগ্রহবশতঃ আমাকে শক্তি প্রদান করেন এবং তিনি তোমাদেরকে পরাজিত করে আমাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। যে খোদা আমাকে সেই অসহায় অবস্থায় সম্রাটের আসনে বসিয়েছেন এবং আমার শত্রুদের পরিকল্পনাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করেছেন, সেই খোদার সাহায্যের উপর আমার আজও বিশ্বাস আছে। আজ আমাকে তিনি শক্তি প্রদান করেছেন। আমি তাঁর নির্যাতিত বান্দাদেরকে সাহায্য না করার ধৃষ্টতা দেখাতে পারব না। তোমরা অসন্তুষ্ট হলেও আমি তাদেরকে এখান থেকে বের করে দিব না।

(তারিখুল খামিস, ১ম খণ্ড- তফসীরে কবীর ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৬-৪৮)

"সেই দলটি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলে মক্কাবাসীরা মুসলমানদেরকে ফেরত আনার অন্য একটি ফন্দি আঁটল। হাবশা অভিমুখে যাত্রাকারী কয়েকটি যাত্রীদলের মধ্যে এই সংবাদ রটিয়ে দেওয়া হল যে, মক্কার

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের মাধ্যমে পরিবেশের মানুষকে ইসলামের গুণাবলী সম্পর্কে অবগত করতে হবে। (সমাপনী ভাষণ, জলসা সালনা বেলজিয়াম, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shamsher Ali, Amir Birbhum District

সমস্ত মানুষ মুসলমান হয়ে গেছে। হাবশার মুসলমানগণ এই সংবাদ শুনে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে এবং অধিকাংশ মুসলমান মক্কায় ফিরে আসে। কিন্তু মক্কা পৌঁছে তারা জানতে পারল যে, ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এই সংবাদ ছড়ানো হয়েছিল, এর মধ্যে কোন সত্যতা নেই। এরপর কিছু লোক হাবশায় পুনরায় ফিরে যায় এবং কিছু সংখ্যা মুসলমান মক্কায় থেকে যায়।"

(দিবাচা তফরীরুল কুরআন, পৃষ্ঠা: ১১২)

যারা মক্কায় ফিরে এল মক্কাবাসী তাদের উপর প্রতিশোধ নেওয়া শুরু করল। তাদের উপর অত্যাচার করত কিন্তু মক্কা ছেড়ে চলে যেতেও দিত না। অতি কষ্টে কয়েকটি দল মক্কা ছেড়ে চলে যেত। এইভাবে বিভিন্ন সময়ে প্রায় একশ জন মুসলমান মক্কা ছেড়ে চলে যেতে সক্ষম হয়। আঁ হযরত (সা.) মক্কায় হিজরত করার সময় কিছু মানুষ পুনরায় ফিরে আসে এবং অন্যান্য যারা অবশিষ্ট ছিল তাদেরকে তিনি (সা.) ৭ হিজরীতে ডেকে নেন।

বর্ণনা অনুসারে নাজাশি বাদশা পরবর্তীকালে মুসলমান হয়েছিল।

(তফসীর কবীর, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৫)

রসুল করীম (সা.) নাজাশি বাদশার মৃত্যু সংবাদ শোনার পর তাঁর জানাযা পড়েছিলেন এবং মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেছিলেন।

(শিবলী, পৃষ্ঠা: ২২১)

এই সময়টি মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত পীড়াদায়ক ছিল। আল্লাহ্ তা'লার উপর একবার ঈমান আনার পর দুঃখ-যন্ত্রণার দরজা খুলে যেত, কিন্তু মুসলমানরা এই সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার ভয়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবার ত্যাগ করে নি বরং প্রত্যেক বিপদ ও পরীক্ষার সময় তাদের ঈমান আরও বেশি দৃঢ় হয়েছে। মুসলমানদের উপর আগত যে সমস্ত বিপদাবলীর কথা ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে সেগুলিই এত বেশি যে শুনলে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে। কিন্তু বাস্তবে সেই সমস্ত বিপদাবলী হয়তো এর থেকে অনেকগুণ বেশি ছিল। পরিবারের কোন সদস্যকে বিভিন্নভাবে যাতনা দেওয়া হতে থাকলে অন্যরাও শান্তিতে থাকতে পারে না। মুসলমানদের সংখ্যা খুবই কম ছিল। তারা কোন প্রকারের প্রতিরোধ করতে সক্ষম ছিল না। হযরত রসূলে করীম (সা.) তাদেরকে কেবল ধৈর্য ও সহনশীলতার শিক্ষার উপর জোর দিতেন এবং ধৈর্যের প্রতিদানে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সুসংবাদ শোনাতেন। এই সুসংবাদ শুনে তারা সমস্ত দুঃখ কষ্ট ভুলে যেত। এই কারণেই মুসলমানরা যাবতীয় নির্যাতন ও নিপীড়ন সহ্য করেছে কিন্তু তওহীদ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় নি। হযরত উসমান (রা.) বয়োঃবৃদ্ধ ছিলেন এবং তিনি (রা.) স্বচ্ছল জীবনযাপন করছিলেন। মক্কার মানুষদের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতাও ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার নাম উচ্চারণ করা এত বড় অপরাধ ছিল যে, তাঁর চাচা হাকাম বিন আবুল আস তাঁকে দড়িতে বেঁধে প্রহার করেছেন। এই অত্যাচার সহ্য করেছেন কিন্তু হযরত উসমান (রা.) কোন কথা বলেন নি, কেবল আল্লাহকে স্মরণ করেছেন।

(তাবকাত ইবনে সাআদ)

একবার একব্যক্তি হযরত রসূলে করীম (সা.) -এর গলায় গামছা দিয়ে এত জোরে টান মারে যে, তাঁর (সা.) চোখ দুটি স্থির হয়ে যায়। হযরত আবু বাকার (রা.) এই দৃশ্য দেখে তাঁকে উদ্ধার করেন। এই কারণে অত্যাচারীরা হযরত আবু বাকার (রা.)-কে এমনভাবে প্রহার করে যে, তিনি (রা.) বাড়ি এসে দেখেন মাথায় হাত দিলে চুল উঠে আসছে।

(ইবনে হুশশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৫১)

হযরত খাব্বাব বিন আল আরিস (রা.) লৌহকার ছিলেন। মক্কার অত্যাচারীরা ভাটি থেকে জ্বলন্ত কয়লা বার করে বিছিয়ে দিয়ে তার উপর তাঁকে চিৎ করে শুইয়ে দিত। বার বার এইভাবে কষ্ট দেওয়ার কারণে তাঁর কোমরের চামড়া পুড়ে কালো ও শক্ত হয়ে গিয়েছিল। হযরত খাব্বাব (রা.) একবার হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, আমাদের জন্য আপনি খোদার কাছে সাহায্য কেন চান না? আঁ হযরত (সা.) শুয়ে ছিলেন। তিনি (সা.) উঠে বসলেন, তাঁর চেহারা রক্তিম হয়ে উঠল। তিনি বললেন-

তোমাদের পূর্বে মানুষের মাথার উপর করাৎ রেখে চিরে দেওয়া হত। লোহার চিরুনীর আঁচড় দিয়ে তাদের দেহ থেকে মাংসখণ্ড তুলে নেওয়া হত। কিন্তু এই যাতনা তাদেরকে ধর্মের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। তিনি (সা.) বলেন-

খোদার কসম! আল্লাহ্ এই ধর্মকে জয়যুক্ত করবেন। নিজের অভিপ্রায় তিনি অবশ্যই পূর্ণ করবেন। এমন সময় আসবে যখন মুসাফিরগণ একাকি যাত্রা করবে এবং খোদা ছাড়া তাদের অন্য কারোর ভয় থাকবে না।

(বুখারী)

যে সমস্ত অসহায় মুসলমানদের জাগতিক সম্পদ ও শক্তি সামর্থ্য কম ছিল তাদের উপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ল। হযরত বিলাল বিন রাব্বাহ (রা.) একজন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁর প্রভু উমাইয়া বিন খালাফ অত্যাচার করার জন্য কুখ্যাত ছিল। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে সে মক্কার উত্তপ্ত বালুকা রাশির উপর হযরত বিলালকে উলঙ্গ করে শুইয়ে রাখত এবং বুকের উপর একটি প্রকাণ্ড পাথর চাপিয়ে দিত। সে বেলালকে জোর দিয়ে বলত, খোদাকে অস্বীকার করলে তবেই শাস্তি থেকে রেহাই পাবে। কিন্তু বেলাল কেবল একটি শব্দই উচ্চারণ করতেন। 'আহাদ' 'আহাদ'। অর্থাৎ আল্লাহ্ এক।

মক্কার ছেলেরা তাঁকে পাথুরে গলি ও রাস্তায় টেনে নিয়ে বেড়াত। তাঁর সমস্ত শরীর রক্তাক্ত হয় যেত। কিন্তু তুবুও তিনি সেই 'আহাদ- আহাদ' উচ্চারণ করতেন।

অনুরূপভাবে আবু ফাকিয়া (রা.), সুহেব বিন সান্নান (রা.) এবং খাব্বাব বিন আল আরিত (রা.)-এর উপর হওয়া অত্যাচারের ঘটনা শুনেআজও অন্তর কেঁপে ওঠে। আঁ হযরত (সা.) তাদের সামনে আল্লাহ তা'লার যে রূপ উন্মোচন করেছিলেন সেটি এতই সৌন্দর্য্যময় ছিল যে তাদের জন্য অনত্র দৃষ্টি ফিরিয়ে নেওয়ার প্রশ্নই ছিল না।

অত্যাচারীরা কেবল পুরুষদেরকেই যাতনা দেয় নি বরং মহিলাদের উপর অসহনীয় অত্যাচার চালিয়েছিল। হযরত যুনেরা (রা.)কে আবু জাহল এত প্রহার করে যে তাঁর দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে যায়। হযরত লুবিনা (রা.) কে হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) (ইসলাম গ্রহণের পূর্বে) খুব জোরে প্রহার করতে থাকতেন। ক্লান্ত হয়ে গেলে একটু জিরিয়ে নিয়ে পুনরায় প্রহার শুরু করতেন। কিন্তু সেই বলিষ্ঠ যুবক প্রহার করেও একজন সেবিকাকে খোদার নাম উচ্চারণ করা থেকে বিরত রাখতে পারে নি।

অত্যাচারীরা আমাদের প্রিয় নবী (সা.)-এর উপরও শারিরিক নির্যাতন করতে কোন দ্বিধা করে নি। তারা বিভিন্ন ভাবে তাঁকে কষ্ট দিয়েছে।

"একবার খানা কাবায় কুফ্ফাররা মহানবী (সা.)-এর গলায় গামছা বেঁধে এমন জোরে টান মারে যে তাঁর চোখ দুটি রক্তিম বর্ণ ধারণ করে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। হযরত আবু বাকার (রা.) এই সংবাদ শুনে দৌড়ে আসেন। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর কষ্ট দেখে তাঁর চোখে অশ্রু নেমে আসে। তিনি (রা.) তাঁকে কুফ্ফারদের হাত থেকে কোনওক্রমে উদ্ধার করেন এবং বলেন, খোদাকে ভয় কর। তোমরা এমন একজনের উপর অত্যাচার করছ যে বলে খোদা আমার প্রতিপালক।

একবার হযরত রসূলে করীম (সা.) মক্কায় একটি ছোট পাহাড়ের উপর বসে গভীর চিন্তায় মগ্ন ছিলেন। হঠাৎ করে সেখানে আবু জাহাল এসে রসুলে করীম (সা.)-কে চড় মেরে বসে এবং অকথ্য ভাষায় গালি দিতে থাকে। তিনি (সা.) চড় খেয়ে গালিও শুনতে থাকলেন, কিন্তু তাঁর মুখ দিয়ে একটি শব্দও বের হল না। সে গালি দিয়ে চলে যাওয়ার পর তিনি (সা.) নীরবে সেখান থেকে নিজের বাড়ি চলে গেলেন। হযরত হামযা (রা.)-এর সেবিকা নিজের বাড়ির দরজা থেকে সমস্ত ঘটনা দেখছিল। হামযা তখনও ইসলাম গ্রহণ করেন নি।

সেবিকা হযরত হামযাকে সমস্ত ঘটনা শোনাল। একজন মহিলার মুখ থেকে এই ঘটনা শুনে হামযা (রা.)-এর আত্মাভিমান জেগে উঠল। তিনি (রা.) দ্রুত খানা কাবার দিকে রওনা দিলেন। সেখানে পৌঁছে আবু জাহালের মুখে ধনুক দিয়ে আঘাত করার পর তাকে কঠোরভাবে সতর্ক করলেন।

"একবার তিনি (সা.) খানা কাবায় নামায পড়ছিলেন। যখন সিজদায় গেলেন, কিছু দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাঁর পিঠের উপর উঁটের নাড়িভুড়ি চাপিয়ে দিল। এটি ভারি হওয়ার কারণে তিনি (সা.) সিজদা

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Jamat Ahmadiyya Bilaspur (Chhattisgarh)

খুতবার শেষাংশ.....

পদমর্যাদা এমন যে, এটি কীভাবে হতে পারে যে, হযরত আবু বকর (রা.) এর বর্তমানে আমাকে আমীর বানানো হবে? তাই আমি তা অপছন্দ করি। এটি ছাড়া বাকি বক্তৃতা ছিল খুবই উন্নত।

যাহোক, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) যখন বলেন যে, মুহাজেরদের মধ্যে যিনি সর্বোত্তম,আমরা তাঁর হাতে বয়আত করব- এর অর্থ ছিল, এ পদের জন্য হযরত আবু বকরের চেয়ে যোগ্য আর কেউ নেই। অতএব একথার পর হযরত আবু বকরের হাতে বয়আত করা আরম্ভ হয়। প্রথমে হযরত উমর (রা.) বয়আত করেন। এরপর হযরত আবু উবায়দা বয়আত করেন। এরপর বশীর বিন সাদ খাযরাজি বয়আত করেন। আর এরপর অওস ও খাযরাজ গোত্রের অন্যান্য লোকেরা বয়আত করে। তখন সাদ, যিনি অসুস্থ ছিলেন এবং উঠে দাঁড়ানোর শক্তি ছিলনা, তার জাতির লোকেরা এমন আবেগ-উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে তাকে ডিঙিয়ে অগ্রসর হয়ে বয়আত করছিল। সুতরাং অল্প ক্ষণের ভেতর সাদ ও হযরত আলী ব্যতীত সবাই বয়আত করে নেয়, এমনকি সাদের পুত্রও বয়আত করে নেয়। হযরত আলী কিছুদিন পর বয়আত করেন। কোন কোন রেওয়ায়েতে তিন দিন উল্লেখ হয়েছে আর কোন কোন রেওয়াতে উল্লেখ হয়েছে যে, ছয় মাস পরে তিনি বয়আত করেছিলেন। ছয় মাসের উল্লেখ সংক্রান্ত রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ফাতেমার সেবা-শুশ্রূষায় ব্যস্ত থাকার কারণে তিনি হযরত আবু বকরের হাতে বয়াত করতে পারেন নি, আর যখন তিনি বয়আত করতে আসেন তখন এই বলে ক্ষমাও চান যে, ফাতেমা যেহেতু অসুস্থ ছিলেন, তাই আমার বয়াত করতে বিলম্ব হয়েছে।

(খিলাফতে রাশেদা পৃ: ৩৯-৪২, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৫)

যাহোক, তখন সবাই বয়আত করে। হযরত উরওয়া বিন যুবায়ের বর্ণনা করেন, আল্লাহ্ তা'লা যখন রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে মৃত্যু দেন তখন মানুষ মহানবী (সা.)-এর জন্য কাঁদতে থাকে এবং তারা বলতে থাকে যে, আল্লাহ্র কসম! তিনি (সা.)-এর পূর্বেই আমরা মারা যাওয়া পছন্দ করতাম। আমাদের আশঙ্কা ছিল যে, তাঁর (সা.) পর কোথাও আবার আমরা ফিতনায় না নিপতিত হই। হযরত মাআন, অর্থাৎ যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে, তিনি বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি এমন আকাঙ্ক্ষা করতাম না। মানুষ এটি বলছিল যে, আমরা যদি পূর্বে মৃত্যু বরণ করতাম ভাল হতো কিন্তু হযরত মাআন বলেন, না, আমি এটি চাইতাম না যে, আমি মহানবী (সা.)-এর পূর্বে মৃত্যু বরণ করব আর তা এই জন্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পরও সেভাবে তাঁর (সা.) সত্যায়ন না করতে পারছি যেভাবে মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশায় আমি তাঁর (সা.) সত্যায়ন করেছি।

(আততাবাকাতুল কুবরা, ৩য় খণ্ড,পৃ: ২৪৪-২৪৫)

অর্থাৎ যেভাবে আমি তাঁকে নবী মেনেছি অনুরূপভাবে তাঁর (সা.) মৃত্যুর পরও এই বিষয়ের সত্যায়ন না করব যে, খেলাফতে রাশেদার ব্যবস্থাপনার যে ভবিষ্যদ্বাণী তিনি (সা.) করেছিলেন তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আর তা প্রতিষ্ঠিত রাখতে হবে এবং মুনাফিক ও মুরতাদদের ফাঁদে পা দেওয়া যাবে না।

সুতরাং এটি হলো ঈমানের সেই মানদণ্ড, যা প্রত্যেক আহমদীর নিজের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। একটি বর্ণনা অনুযায়ী মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর মুরতাদ ও বিদ্রোহীদের দমনে হযরত মাআন হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদের সাথে ছিলেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ দুইশত অশ্বারোহীর সাথে হযরত মাআনকে অগ্রবাহীনি হিসেবে ইয়ামামায় প্রেরণ করেছিলেন। (আল আসাবা ফি তামিযিস সাহাবা, ৬ ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১৫১)

মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন খাত্তাবের সাথে হযরত মাআনের ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেছিলেন। এই উভয় সাহাবী হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-র খেলাফতকালে ১২ হিজরী সনে ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত লাভ করেন। সকল আহমদীকেও আল্লাহ্ তা'লা নবুওয়তের পদমর্যাদা অনুধাবন করার তৌফিক দান করুন এবং খিলাফতের সাথে বিশ্বস্ততা ও নিষ্ঠার সম্পর্ক স্থাপনেরও তৌফিক দিন।

****

যুগ খলীফার বাণী

জাগতিক কামনা-বাসনার শির্ক এড়িয়ে চলারও প্রয়োজন আছে।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Nur Alam, Amir Jalpaiguri District**

থেকে মাথা তুলতে পারছিলেন না। হযরত ফাতেমা (রা.) একথা জানতে পেরে কাঁদতে কাঁদতে সেখানে উপস্থিত হলেন এবং রসুলুল্লাহ (সা.)-এর পিঠ থেকে নাড়িভুড়ির বোঝা নামিয়ে দিলেন।" (বুখারী,আবওয়াবুল ওজূ)

"একবার তিনি বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় মক্কার ইতর প্রকৃতির মানুষের একটি দল তাঁর চারপাশে এসে জমা হয়। তারা সারা রাস্তা রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ঘাড়ে চড় মেরে চলেছিল আর বলছিল-

হে লোক সকল! এই ব্যক্তি নবী হওয়ার দাবি করছে।

তাঁর বাড়িতে আশেপাশের বাড়িগুলি থেকে অনবরত পাথর নিক্ষেপ করা হত। হেঁশেলঘরে ছাগল ও উঁটের নাড়িভুড়ি সহ বিভিন্ন প্রকারের নোংরা আবর্জনা নিক্ষেপ করা হত। নামায পড়ার সময় তাঁর (সা.) উপর ধুলোবালি ছড়ানো হত। অবশেষে তিনি (সা.) বাধ্য হয়ে পাহাড়ের টিলা থেকে বেরিয়ে এসে পাথরের নীচে লুকিয়ে নামায পড়তেন। এতকিছু সত্ত্বেও তিনি এক-অদ্বিতীয় খোদার নাম প্রচার করে গেছেন এবং তাদের হিদায়তের জন্য আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়াও করতে থেকেছেন।"

(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ৬৩-৬৫)

তিনি (সা.) মুসলমানদেরকে ধৈর্যের উপদেশ দিতেন। তিনি (সা.) বলতেন- আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ক্ষমা করার আদেশ দিয়েছেন। আমি তোমাদেরকে যুদ্ধ করার অনুমতি দিতে পারি না।

(নিসাই, তালখীসুস সুহাহ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫২)

তিনি (সা.) অত্যন্ত ধৈর্যশীলতা এবং অবিচলতার সঙ্গে দাওয়াতে ইলাল্লহ্র কাজ অব্যাহত রাখেন।

আমাদের প্রিয় নবী (সা.) এই সমস্ত দুঃখ-কষ্ট এই কারণে সহ্য করেছিলেন যেন সমধিক হারে মানুষ খোদার দরবারে নতশির হয় যাতে তারা এই পৃথিবীতেও সুখে থাকে এবং পরকালেও জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পেয়ে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির জান্নাতে প্রবেশ করে। আমাদেরকেও এই আবেগ ও স্পৃহা নিয়ে 'দাওয়াতে ইলাল্লাহ'-র কাজ অব্যাহত রাখা উচিত। যদি কোন কষ্টের সম্মূখীন হতে হয়, তবে মনে রাখতে হবে আমাদের প্রিয় নবী (সা.) যে আমাদের থেকে অনেক বেশি দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছিলেন।

গালি শুনে দোয়া দাও, দুঃখ পেয়ে আরাম দাও।

যেখানেই অহমিকা চোখে পড়ে তোমরা বিনম্রতা প্রদর্শন কর।

****

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) বলেছেন:

" আমি আপনাদেরকে শুভ সংবাদ দিচ্ছি যে, এরপর আহমদীয়া খিলাফত কখনও ভয়ংকর বিপদে পড়বে না ইনশাআল্লাহ্ । আহমদীয়া জামাত এখন আল্লাহ্র দৃষ্টিতে সাবালক হয়েছে। শত্রুর কোন দৃষ্টি, শত্রুর কোন অন্তর, শত্রুর কোন চেষ্টা এ জামাতের চুলও বাঁকা করতে পারবে না। আহমদীয়া খিলাফত ইনশাআল্লাহ্ ঐ সমস্ত শান-শওকত মান-মর্যাদা নিয়েই বৃদ্ধি ও বিকাশ লাভ করতে থাকবে। যে শান-শওকতের প্রতিশ্রুত আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে দিয়েছেন। কমপক্ষে একহাজার বছর পর্যন্ত এ জামাত জীবিত থাকবে। সুতরাং দোয়া করতে এবং আল্লাহ্র প্রশংসার গীত গাইতে থাকুন। এবং নিজেদের (বয়আতের) প্রতিজ্ঞার নবায়ন করুন।

(আল ফযল, ২৮শে জুন, ১৯৮২, লন্ডন আল ফযল ইন্ট্যার ন্যাশনাল, ১৩ জুন, ২০০৩)

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) তাঁর প্রথম জুমআর খুতবায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই ভবিষ্যদ্বাণী পাঠ করে শোনান।

" আমি বড় দাবী ও দৃঢ়তার সাথে বলছি, আমি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আর আল্লাহ্ তা'লার ফযলে এ ক্ষেত্রে আমারই বিজয় অবধারিত। যতদূর আমি আমার দূরদৃষ্টি নিক্ষেপ করে দেখেছি সমস্ত পৃথিবীকে আমি আমার পদতলে সমর্পিত দেখেছি। আর নিকট ভবিষ্যতে আমি এক মহান বিজয় লাভ করতে যাচ্ছি। কেননা আমার কথার সমর্থনে আরেকজন কথা বলছে....

যুগ খলীফার বাণী

প্রকৃত সফলতা লাভ এবং জীবনের স্বার্থকতা পূরণের জন্য আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পূর্ণ আনুগত্য করা জরুরী।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে মে, ২০১৯)

Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gouhati)

নয়। আমরা ভবিষ্যতে আরও অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করব। আমার বক্তব্যে আপনাদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর রয়েছে।

ইসলামী শিক্ষার বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামী শিক্ষা সেটিই যা কুরআন বর্ণনা করেছে এবং আঁ হযরত (সা.) নিজ কর্মধারার মাধ্যমে করে দেখিয়েছেন এবং বর্ণনা করেছেন। আমি নিজের ভাষণে সেই ইসলাম সম্পর্কেই বর্ণনা করেছিলাম, ভিন্ন কোন ইসলাম ছিল না সেটি। এটিই প্রকৃত ইসলাম। মিডিয়া বা মুষ্টিমেয় চরমপন্থী সংগঠন যা উপস্থাপন করে সেটি ইসলাম নয়। একমাত্র আমরাই পৃথিবীতে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসার করছি। এই ইসলাম অনুধাবন করে লক্ষ লক্ষ মানুষ ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে।

এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, গোয়াতেমালায় স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে সংকট রয়েছে, চিকিৎসা পরিষেবায় ঘাটতি রয়েছে। আপনারা এই মানের হাসপাতাল অন্যান্য এলাকাতেও কি তৈরী করবেন? হুযুর বলেন: এমন বিরাট আকারে হাসপাতাল তৈরী যদিও সম্ভব নয়, তবে যেভাবে আমরা আফ্রিকার বিভিন্ন এলাকায় ক্লিনিক তৈরী করে প্রাথমকি চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করছি এবং পরে সেগুলি ক্রমে হাসপাতাল হয়ে উঠেছে। অনুরূপভাবে পরিস্থিতি বিচারে আরও ক্লিনিক শুরু করা যেতে পারে।

ইকুয়েডরের একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, হাসপাতাল স্থাপনের জন্য এই স্থানটি কেন নির্বাচন করা হল? এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের নিজেদের সম্পদের সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। সাধারণত শহরের মানুষ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়ে থাকে, পক্ষান্তরে প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষজন সেই সব সুযোগ সুবিধ কম পেয়ে থাকে। সেবাই আমাদের লক্ষ্য, অর্থাপর্জন নয়। আমাদের সম্পদ দিয়ে যতটুকু সম্ভব তা দিয়েই আমরা সেই সব অঞ্চলে হাসপাতাল তৈরী করি যেখানে প্রয়োজন।

প্যারাগুয়ে থেকে আগত এক সাংবাদিক বলেন, সেখানে জামাত উন্নতি করছে, এযাবৎ ত্রিশজন আহমদী হয়েছে। জামাতের প্রসার ও উন্নতি লাভ সম্পর্কে আপনার মতামত কি? এর উত্তরে হুযুর বলেন: আমাদের জামাতটি নিতান্তই একটি ধর্মীয় জামাত। ধর্মীয় জামাত মন্থর গতিতেই এগিয়ে চলে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) একটি ছোট্ট গ্রাম থেকে নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবি করেছিলেন। ক্রমে তাঁর বাণী বহির্জগতে বিস্তার লাভ করে আর শত শত মানুষ তাঁকে গ্রহণ করেন। মান্যকারীদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি লাভ করে লক্ষে লক্ষে পৌঁছে যায়। এই সংখ্যা আজও বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। আজ আমরা পৃথিবীর ২১২টি দেশে পৌঁছে গেছি আর প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ জামাতের অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। অনুরূপভাবে প্যারাগুয়েও আমরা জামাতের বাণী প্রচার করছি। এই বাণী যাদের পছন্দ হচ্ছে তারা গ্রহণও করছে। অনেক বিরুদ্ধবাদীও রয়েছে, কিন্তু আমাদের বাণী মানুষের অন্তরাত্মাকে স্পর্শ করছে যার কারণে তারা গ্রহণ করে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের আশা, প্যারাগুয়ের মানুষদের আমাদের বাণী পছন্দ হবে, তারা গ্রহণ করবে বা তাদের আগামী প্রজন্ম গ্রহণ করবে। হাসপাতাল স্থাপন বা জনসেবামূলক কাজ এই জন্য করছি না যে এগুলি দেখে মানুষ ইসলাম গ্রহণ করবে। এগুলি নিছক মানবতার সেবার জন্যই। গোয়াতেমালা হোক বা প্যারাগুয়ে বা বেলিজ হোক- তারা ইসলাম গ্রহণ করুক বা না করুক, আমরা নিজেদের প্রচার কাজ অব্যাহত রাখব।

ত্রিশজন আপাতত খুবই কম, এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। কাদিয়ান গ্রাম থেকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন দাবি করেছিলেন, তখন কোন উপায় উপকরণ বা যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর জীবদ্দশাতেই তাঁর মান্যকারীর সংখ্যা চার লক্ষে পৌঁছে গিয়েছিল। আজ ২১২টি দেশে বসবাসরত আহমদীদের সংখ্যা কয়েক কোটি অতিক্রম করেছে আর এই সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ধর্মীয় দলগুলি এভাবেই বিস্তার লাভ করে থাকে । ইনশাআল্লাহ্ প্যারাগুয়েতেও এভাবেই ধীরে ধীরে জামাত বৃদ্ধি পাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: খৃষ্টধর্ম পৃথিবীতে বিস্তার লাভ করতে তিনশ বছরের বেশি সময় নিয়েছিল। জামাত আহমদীয়ার প্রবর্তক হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বলেছেন, 'আমি মসীহর পদাঙ্ক অনুসরণে এসেছি। তিনশ বছর অতিক্রম হতে না হতেই পৃথিবীতে জামাত আহমদীয়ার আধিপত্য হবে এবং জগতবাসী সেই ইসলামের মান্যকারী হবে যা আঁ হযরত (সা.) দ্বারা আনীত প্রকৃত ইসলাম।' হুযুর বলেন, যদি একজন ব্যক্তি গাণিতিক হারে বৃদ্ধি পেয়ে এক কোটিতে পৌঁছে যায়, তবে এই ত্রিশজন ব্যক্তির প্রত্যেকে গাণিতিকহারে বৃদ্ধি পেয়ে হাজার হাজার এমনকি লক্ষ লক্ষে পৌঁছে যাবে। ইনশাআল্লাহ॥

নাসের হাসপাতাল উদ্বোধন উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শুনে অতিথিদের প্রতিক্রিয়া

গোয়াতেমালার মেম্বার অফ পার্লামেন্ট ইলিয়ানা কালিস বলেন, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফাকে এয়ারপোর্টে অভ্যর্থনা জানাতে যাওয়া আমার জন্য অনেক বড় সম্মানের বিষয়। এছাড়াও নাসের হাসপাতাল উদ্বোধনের জন্য খলীফা সাহেবের এখানে সস্ত্রীক আগমণ গোয়েতেমালার জন্য গর্ব ও সম্মানের কারণ। তিনি কথপোকথনের সময় জানিয়েছেন যে বিমান থেকে গোয়েতেমালার সবুজ শ্যামল ভূমি তাঁকে মুগ্ধ করেছে।

খলীফার প্রশ্নের উত্তরে আমি জানিয়েছি যে আমাদের ১৫৮জন সাংসদ রয়েছেন যারা আইন প্রণয়নের অধিকার রাখেন, এঁরা সেনেট নন। আমি শাসকদলের সাংসদ এবং পার্লামেন্টিরিয়ান গ্রুপের ইনচার্জ। এছাড়াও পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে আমার দায়িত্বে পাঁচটি কমিশন রয়েছে যেগুলির আমি তত্ত্বধান করে থাকি। কমিশনগুলি হল, অর্থনীতি, প্রতিরক্ষা, সংস্কৃতি, খাদ্য এবং নারী সংক্রান্ত বিষয়ের কমিশন। এগুলি সবই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রালয় এবং প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত।

খলীফা কেবল হাসপাতাল উদ্বোধনের সময় যে বার্তা দিয়েছেন তা এক অনন্য এবং শান্তিদায়ক প্রেমের বাণী ছিল। নাসের হাসপাতাল অভাবীদের জন্য এমন এক আশীর্বাদ স্বরূপ যার গুরুত্ব অপরিসীম। আমার ধারণা মতে এই পবিত্র অনুষ্ঠানে প্রায় সাতশ মানুষ উপস্থিত ছিলেন, যাঁরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এসেছিলেন আর তাঁরা গভীর মনোনিবেশ সহকারে খলীফার ভাষণ শুনছিলেন। এই হাসপাতাল উদ্বোধনের কারণে হিউম্যানিটি ফার্স্ট সেবামূলক কাজের বিষয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে খ্যাতি অর্জন করবে। আমরা গোয়েতেমালার বাসিন্দা হিসেবে এই হাসপাতাল নির্মিত হওয়ায় যারপরনায় আনন্দিত হয়েছি। খলীফার প্রতি আমরা কৃতজ্ঞা, কেননা তাঁর নেতৃত্বেই নাসের হাসপাতাল নির্মাণ হওয়া সম্ভব হয়েছে।

আমি ব্যক্তিগতভাবেও খলীফার সসম্ভ্রম ব্যক্তিত্ব ও স্নেহপরায়ণতায় বেশ প্রভাবিত হয়েছি। তিনি মানবতার সেবা এবং পারস্পরিক সহানুভুতি এবং প্রেমের বার্তা দিয়েছেন।

মারিও ফিগুরোয়া, ভাইস মিনিস্টার অফ হেল্থ নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, হাসপাতালটির নির্মাণকার্য একেবারেই গোড়া থেকে দেখেছি। এখানে আমি পূর্বেও বেশ কয়েকবার এসে দেখেছি কিভাবে তারা মালপত্র নিয়ে আসছে আর কিভাবে শ্রমিক জোগাড় করছে।

এখন এটি এক দৃষ্টিনন্দন অট্টালিকায় পরিণত হয়েছে। এটি আমাদের দেশের জন্য অগ্রগতির প্রতীক। হাসপাতালটি আশপাশের মানুষের জন্য সহায়ক হবে। আমার জন্য এটি এক বিরাট অভিজ্ঞতা ছিল। মানবতার ক্ষেত্রে আহমদীয়া মুসলিম জামাতে নিজেদের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থানীয় ঐক্য রয়েছে যা এক অমূল্য বস্তু।

ক্যালিফোর্নিয়ার কংগ্রেস ওম্যান নোরমা তোরেস সাহেবা বলেন: আজকের অনুষ্ঠান অত্যন্ত কার্যকরী এবং সফল ছিল। হিউম্যানিটি ফার্স্ট খুব ভাল কাজ করছে। আজ খলীফার সঙ্গে বসে খাওয়ার সুযোগ হয়েছে। এই বিষয়টিই আমার কাছে অনুষ্ঠানটি স্মরণীয় করে রাখবে। জামাত আহমদীয়া গোয়েতেমালা এদেশে যে কাজ করছে তার জন্য আমি তাদেরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। হুযুর অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি যিনি সমগ্র বিশ্বকে শান্তি, ভালবাসা এবং সম্প্রীতির বার্তা দিচ্ছেন। গোয়েতেমালার নাসের হাসপাতাল সকল ধর্ম, জাতি এবং বর্ণের মানুষের সেবা করবে যা খুব ভাল বার্তা।

সার্জিও সেলিস সাহেব গোয়েতেমালান কংগ্রেসে 'সাকাতে পেকিস' জেলার প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন। তিনি বলেন, এটি আমাদের দেশ এবং জেলার জন্য ঐতিহাসিক মুর্হুত। কেননা, নাসের হাসপাতাল কেবল মানুষের সাহায্যের জন্য তৈরী হয়েছে যা আমাদের দেশের জন্য এক গভীর সমস্যা। এখানে এর বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এই কাজের জন্য আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রীকেও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আমি জামাত আহমদীয়া এবং হিউম্যানিটি ফার্স্টের প্রতি কৃতজ্ঞ। চার বছর পূর্বে আমি লন্ডন জলসায় অংশগ্রহণ করেছিলাম যেখানে হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলাম। সাক্ষাতের সময় আমি হুযুরকে জানিয়েছিলাম যে গোয়েতেমালায় স্বাস্থ্য পরিষেবার ভীষণ প্রয়োজন। যা শুনে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 4 Thursday, 26 Sep, 2019 Issue No.39

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

গোয়েতেমালায় হাসপাতাল তৈরী করব। আজ আমরা এটিকে বাস্তবায়িত হতে দেখছি। খলীফা এমন এক ব্যক্তি যিনি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্তভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং প্রত্যেক জাতির কাছে ভালবাসার বাণী পৌঁছে দিচ্ছেন। সরকার এবং অন্যান্য ধর্মের মানুষদেরকেও এই বাণীর প্রসার করা উচিত। খলীফা তাঁর ভাষণে যেভাবে একথা উল্লেখ করেন তা প্রত্যেক শ্রোতার মনে প্রশান্তি এনে দেয়।

প্যারাগুয়ের উপ শিক্ষামন্ত্রী রবার্ট কানো সাহেব বলেন: খুব ভাল অনুষ্ঠান ছিল। এই জামাতের সদস্যরাই সংঘবদ্ধভাবে হাসপাতালটি নির্মাণ করেছেন যা আমাকে আশ্চর্য করেছে। এর দ্বারা গরীব মানুষদের সাহায্য করা হবে। মানুষকে ব্যবহারিকভাবে ভালবাসার এটি এক উৎকৃষ্ট পন্থা, যে কথা খলীফা নিজের ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন। মানবতা যদি ভালবাসার এই পথ অবলম্বন করে তবেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ইসলাম ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে খুব কাছে থেকে জানার এ এক সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল। জামাত আহমদীয়া সম্পর্কে আমার মনে অনেক জিজ্ঞাসা ছিল যেগুলির উত্তর এখানে এসে পেয়েছি। কিছু বছর থেকে প্যারাগুয়েতে জামাতও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমি তাদের আমন্ত্রণেই এখানে এসেছি।

প্রাক্তন গভর্ণর জাসিন্তো কাস্ত্রো নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: হাসপাতালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সম্মান লাভ করা আমার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় ছিল। আমি এজন্যও আনন্দিত যে এই হাসপাতাল মানবতার সেবার জন্য নির্মিত হয়েছে। হুযুর আনোয়ার-এর ভাষণ সম্পর্কে বলতে চাই যে, এটি ছিল শান্তি ও নিরাপত্তার বাণী। লন্ডনের জলসায় একবার খলীফার ভাষণ শোনার সুযোগ হয়েছে যা এখনও আমার স্মরণে আছে। তিনি বলেছিলেন পিতামাতার সম্মান কর যাতে সফল হও। হুযুরের আজকের ভাষণটিও উৎকৃষ্ট মানের।

চিভা ভালাসকো যিনি পর্যটন এবং মায়া সংস্কৃতির আন্তর্জাতিক দূত, তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: আল্লাহ্ আপনাদের সকলকে এই কর্মের প্রতিদান দিন। হাসপাতাল নির্মাণের জন্য আপনাদেরকেও ধন্যবাদ। কেননা, এত উন্নত মানের হাসপাতাল এই দেশে ইতিপূর্বে তৈরী হয় নি। মানুষ মুসলমানদের সম্পর্কে ভয়ভীত। কিন্তু আমার মতে মুসলমানেরা সহৃদয় এবং অতিথিপরায়ন।

রিচার্ড নামে এক সাংবাদিক বলেন: সব থেকে বড় কথা হল খলীফা এমন একটি দেশে এসেছেন যেটি দারিদ্র জর্জরিত। ল্যাটিন আমেরিকার কোনও দেশে এই প্রথম তিনি এলেন। তাঁর আসা খুব দরকার ছিল। এটি এমন একটি দেশ যেখানে ইসলাম সম্পর্কে মানুষ জানতে চায় এবং এই ধর্ম নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে চায়। আমি আশা করি ভবিষ্যতেও খলীফা আমাদের দেশে আসবেন। খলীফার বক্তব্য সম্পর্কে বলতে চাই যে, জামাত আহমদীয়া দরিদ্রদের সহায়তা করার এবং শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী প্রসারে আগ্রহী। খলীফা তাঁর ভাষণে যে বার্তা আমাদের দিয়েছেন তা অতীব উৎকৃষ্ট মানের।

আরেন্ডো মন্টেরেসো একজন ব্যাঙ্ক ম্যানেজার, তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: খুব ভাল অনুষ্ঠান ছিল। এর থেকে আমাদের দেশ উপকৃত হবে জেনে প্রশান্তি বোধ করছি। হুযুরের বক্তব্য অত্যন্ত আকর্ষণীয় ছিল এবং তাঁর বাণীও ছিল উচ্চমানের। তিনি সমগ্র মুসলিম জাতির পক্ষ থেকে এই বাণী দিয়েছেন যে মানবতার সেবা করা সকলের কর্তব্য। সব থেকে পছন্দীয় বিষয়টি ছিল মানুষের নিঃস্বার্থ সেবা করার স্পৃহা। জামাতে আহমদীয়ার দর্শন এবং এদেশে জামাতের পরিকল্পনা আমার জন্য কৌতুহলের বিষয়।

গুলেরমো গোঞ্জালেস নামে গোয়েতেমালা থেকে একজন পশু চিকিৎসক বলেন: গোয়েতেমালায় এই মিশনের সূচনা করার জন্য জামাত আহমদীয়াকে ধন্যবাদ। খলীফার বক্তব্য মানুষের মধ্যে এই চেতনাবোধ জাগিয়ে তোলে যে মানুষের কিভাবে একজন অভাবী মানুষের সহায়তা করা উচিত। এইকাজ জামাত আহমদীয়া দীর্ঘদিন থেকে করে আসছে। আমি আশা করি, তারা এই কাজ ভবিষ্যতেও অব্যাহত রাখবে। আমার এটিও ভাল লেগেছে যে আপনারা কোন ভেদাভেদ করেন নি, সমস্ত দরিদ্র মানুষদের জন্যই এটি তৈরী হয়েছে।

জর্জ সামায়োয়া নামে গোয়েতেমালার এক চিকিৎসক বলেন: আজকের অনুষ্ঠান সুন্দর ও অসাধারণ ছিল। এত মানুষ বাইরে থেকে এসেছেন, প্রত্যেকের একটিই উদ্দেশ্যে- ভালবাসা ও সম্প্রীতির প্রসার ঘটানো। খলীফার বক্তব্য কেবল গোয়েতেমালার জন্যই নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য। গোয়েতেমালার ইতিহাসে আজকের দিনটি খলীফার আগমণ দিন হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই আশিসমণ্ডিত অনুষ্ঠানে আমাকে আমন্ত্রিত করার জন্য আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

রউল মেসেলি নামে জামাতের এক শুভাকাঙ্খী নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: আজ খলীফার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত ছিল। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করে আমি ধন্য হয়েছি। আমি তাঁর সম্পর্কে কেবল শুনেছিলাম, কখনও তাঁকে দেখার সুযোগ হয় নি। তিনি সত্যিই একজন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি। তিনি জামাত আহমদীয়া গোয়েতেমালাকে হাসপাতাল তৈরীর অনুমতি দিয়েছেন। এখন আমরা এই স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে সঠিকভাবে উপকৃত হতে পারব। এছাড়াও আমাদের স্থানীয় চিকিৎসকদেরকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ থেকে প্রশিক্ষন দেওয়া হবে। আমি এই সমস্ত কাজগুলিকে অত্যন্ত প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখি। সংক্ষেপে বলা যায়, খলীফা মানুষকে ভালবাসেন, এই কারণেই তিনি এখানে এসেছেন। ইসলামের একাধিক উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে এটি অন্যতম।

মিস ডোনিস নামে এক সংবাদ পত্রিকার নির্দেশক বলেন: আমি আপনাদেরকে সাধুবাদ জানাচ্ছি এবং সঙ্গে একথাও বলতে চাই যে, আমাদের দেশে এই ধরণের অনুষ্ঠান আরও হওয়া উচিত। খলীফার ভাষণ ভালবাসা এবং মানবতার প্রতি সহানুভুতিতে পরিপূর্ণ ছিল। আপনারা জনসাধারণের কল্যাণার্থে এক বিশাল হাসপাতাল তৈরী করেছেন, এর জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। আমাদের প্রত্যেক জেলায় এমন প্রকল্প হওয়া উচিত। আমাদের প্রত্যেকটি এলাকায় এমন প্রকল্প রূপায়িত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

ফার্নান্দো পিনেতা নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন: খলীফার বাণী হৃদয়গ্রাহী ছিল, যা সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছে। নাসের হাসপাতাল প্রকল্পটি অসাধারণ, আমাদের এমনই আরও অনেকগুলি প্রকল্পের প্রয়োজন যা গোয়েতেমালার উপকার করবে।

কোস্টারিকা থেকে আগত এক নবদীক্ষিত আহমদী বলেন: আমার মতে গোয়েতেমালার মানুষ চিকিৎসা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে বিচলিত ছিল। তাদের উৎকণ্ঠা দূর করার জন্য নাসের হাসপাতাল অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। ইনশাআল্লাহ॥

একজন স্থানীয় গোয়েতেমালান বিজনেস ওম্যান বলেন: আপনাদের খলীফর পক্ষ থেকে দেওয়া শান্তি ও ভালবাসার শিক্ষা খুব ভাল লেগেছে। তাঁর একথাও ভাল লেগেছে যে কোনও প্রতিদানের আশা না করে অভাবীদের সাহায্য করাই প্রকৃত ইসলামের চেতনা। যাচনাকারী যাচনার পূর্বেই তাকে দান কর। তাঁর এই কথা আমার হৃদয়ে গেঁথে গেছে। (ক্রমশ...)

যুগ ইমামের বাণী

কুরআন করীমের শিক্ষার উপর আমল করেই তাকওয়া সৃষ্টি হওয়া এবং ব্যবহারিক সৌন্দর্য বিকশিত হওয়া সম্ভব।

মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

যুগ খলীফার বাণী

খিলাফত ব্যবস্থাপনা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিধান ও ব্যবস্থাপনারই একটি অঙ্গ।

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২৪ শে মে, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: **Golam Kibria and Family, Jamat Ahmadiyya Santoshpur**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir